~~4858~~

~~1353~~

~~Sf.~~

বুনিয়াদী শিক্ষা

বিজয়কুমার

প্রাপ্তিস্থান :
ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানি
৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

মূল্য : দুই টাকা

তৃতীয় সংস্করণ : ১৯৫৫

মুদ্রাকর :
শ্রীধনঞ্জয় প্রামাণিক, সাধারণ প্রেস লিমিটেড
১৫এ, ক্ষুদিরাম বসু রোড, কলিকাতা-৬

প্রকাশক :
শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক
৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

বুনিয়াদী শিক্ষার কাজে আমার সহকর্মী
শ্রীমতী সাধনাকে বইখানি দিলাম।

ভূমিকা

বন্ধুবর শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেনের আগ্রহে বিভিন্ন সময়ে বুনিয়াদী শিক্ষা সম্বন্ধে কয়েকটি প্রবন্ধ লেখা হয়েছিল। তাঁরই আগ্রহে আজ তার মধ্যে কয়েকটি একত্র করে পুস্তকাকারে প্রকাশ করা হল। প্রবন্ধগুলি প্রায় সমস্তই 'শিক্ষা' মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

একটি প্রবন্ধকে কিছু পরিবর্ধিত করা হয়েছে। অন্যগুলি যেমন ছিল প্রায় তেমনই আছে। বিভিন্ন সময়ের লেখা বলে প্রবন্ধগুলির মধ্যে অনেক কথারই পুনরুক্তি হয়েছে। পরিবর্তন করতে হলে অনেকখানি করতে হয়। সেটা সম্ভব হয়ে উঠবে না বলে সে চেষ্টা করি নাই। 'বুনিয়াদী শিক্ষার মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি' প্রবন্ধটি অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অনাথনাথ বসুর ইংরেজী প্রবন্ধের অনুবাদ।

প্রবন্ধগুলিতে বুনিয়াদী শিক্ষার বিভিন্ন দিক আলোচিত হয়েছে। এর থেকে বুনিয়াদী শিক্ষার একটা মোটামুটি পরিচয় পাওয়া যাবে। এখনও অনেকের মনে বুনিয়াদী শিক্ষার সম্বন্ধে একটা ভ্রান্ত ধারণা আছে। বইখানি এই ভ্রান্ত ধারণা দূর করতে খানিকটা সাহায্য করবে বলে আশা করি।

বিজয়কুমার

সূচীপত্র

—এক—

পূর্ব-ইতিহাস

১৯৩৭ সাল। নূতন ভারত-শাসন-আইন অনুসারে প্রদেশে প্রদেশে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সাতটি প্রদেশে কংগ্রেস-মন্ত্রিমণ্ডল গঠিত হয়েছে। দেশশাসনের দায়িত্ব সেখানে কংগ্রেসের উপর এসে পড়েছে। দেশশাসনের বহুবিধ সমস্যার মধ্যে শিক্ষার সমস্যাও আছে। দেশের অগণিত ছেলে-মেয়ের শিক্ষার কোন ব্যবস্থা নাই। তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। বহু বৎসর ধরে কংগ্রেস ইংরেজ-সরকারের কাছে সার্বজনিক শিক্ষার দাবি জানিয়ে এসেছে। সে শিক্ষা আবশ্যিক হবে এবং অবৈতনিক হবে। ছেলের বাপ-মার ইচ্ছা থাকুক আর নাই থাকুক ছেলেকে শিক্ষা দিতেই হবে। তবে, সে শিক্ষার জন্য বাপ-মাকে পয়সা খরচ করতে হবে না। সরকার সে শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করবে। এই ছিল কংগ্রেসের দাবি। ইংরেজ-সরকার একটা না একটা ওজর করে সে দাবি এতদিন উপেক্ষা করেছে। এখন যখন কংগ্রেসের হাতে দেশশাসনের ক্ষমতা এল, তখন এই দাবি পূর্ণ করার দায়িত্বও তার সঙ্গে সঙ্গেই এসে পড়ল। এতদিন ধরে ইংরেজ-সরকারকে সে যা করতে বলেছে আজ তাকে তাই করতে হবে।

অনেক প্রশ্নই এসে পড়ল। শিক্ষা তো দিতে হবে। কিন্তু কেমন শিক্ষা, কতদিনের শিক্ষা এবং কিভাবেই বা তা দেওয়া হবে?

এতদিন ধরে যে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে তার সঙ্গে জাতির জীবনের যোগ ছিল না। এই বিজাতীয় শিক্ষার লক্ষ্য ছিল ইংরেজ-সরকারের রাজকার্য পরিচালনার জন্য কর্মচারী তৈয়ারি করা। এই শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে যারা বেরোয়, চাকরি করা ছাড়া আর কোন কিছুর যোগ্যতা তাদের থাকে না। চাষীর ছেলে, শিল্পীর ছেলে, ব্যবসায়ীর ছেলে এই শিক্ষা লাভ করে নিজের পৈতৃক বৃত্তি এবং পৈতৃক বাসভূমি ত্যাগ করে চাকরির আশায় সহরের দিকে ছোটে। তাই গ্রামগুলি ক্রমশঃই জনহীন এবং গ্রামের কৃষি, শিল্প, ব্যবসায় নষ্ট হয়ে যাওয়ার ফলে দিনের পর দিন দরিদ্র হয়ে পড়েছে। তা ছাড়া, একটা বিদেশী ভাষার মাধ্যমে এই শিক্ষা দেওয়া হয়। ছেলের চিন্তার স্বাভাবিক মাধ্যম তার মাতৃভাষা। তার থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলে ছেলের মনের যথোচিত বিকাশ হয় না। শুধু তাই নয়। শিক্ষা শিক্ষিতদের মধ্য দিয়ে দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে এবং আস্তে আস্তে সমগ্র জনসাধারণকে শিক্ষিত করে তুলবে, এই হওয়া উচিত। কিন্তু বিদেশী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষার ব্যবস্থা হওয়ায় তা সম্ভব হয় নাই, শিক্ষা মুষ্টিমেয় শিক্ষিতদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে রয়ে গেছে। তার ফলে দেশের শিক্ষিত এবং অশিক্ষিতদের মধ্যে ক্রমে ক্রমে একটা বিরাট ব্যবধান গড়ে উঠেছে। অশিক্ষিত জনসাধারণের সঙ্গে শিক্ষিতদের প্রাণের যোগ নাই।

দেশের সর্বসাধারণের জন্য যে শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে তা পরিমাণেও অত্যন্ত কম। প্রাথমিক শিক্ষার কাল কোথাও চার বছর, কোথাও পাঁচ বছর। সাধারণতঃ পাঁচ ছয় বছর বয়সে ছেলে স্কুলে যায় এবং দশ এগার বৎসরের মধ্যেই তার শিক্ষা শেষ করে

বেরিয়ে আসে। অনেকের পক্ষে এই শিক্ষার সমাপ্তি পর্যন্ত অপেক্ষা করাও সম্ভব হয় না। এই যে স্বল্প শিক্ষা, এর ফলে ছেলের চরিত্রগঠন হয় না, তার সামাজিক কর্তব্যবোধ জাগে না, এমন কি সে ভাল করে লিখতে পড়তেও শেখে না। স্কুলে যেটুকু শিক্ষা পায় চর্চা না থাকার জন্য অল্পদিনেই তা ভুলে যায় এবং শেষ পর্যন্ত ছেলে যে নিরক্ষর সেই নিরক্ষরই হয়ে পড়ে।

তারপর শিক্ষার ব্যয়নির্বাহের কথা। এমনিই তো দরিদ্র দেশ। অর্থের অভাব। তার উপর, শাসন-ব্যবস্থা ইংরেজের তৈয়ারি। মোটা টাকা শাসনকার্য পরিচালনার জন্যই ব্যয় হয়ে যায়। জাতিগঠনের কাজের জন্য অল্পই অবশিষ্ট থাকে। এই স্বল্পপরিমাণ অর্থের উপরে নির্ভর করে জাতিগঠনের কোন কাজই করা যায় না। শিক্ষার কাজও না। নূতন করে ট্যাক্স বসিয়ে অর্থসংগ্রহের ব্যবস্থা হয়তো করা যেতে পারে। কিন্তু এজন্য যে বিপুল অর্থের প্রয়োজন তা পুরাপুরি সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। দেখতে গেলে, সমস্ত খরচ-খরচা চালিয়ে আবগারি-বিভাগের আয়টুকুই একরকম বাকি থাকে শিক্ষার ব্যয়নির্বাহের জন্য। সুতরাং শিক্ষার ব্যয় বাড়াতে হলে আবগারির আয়ও বাড়াতে হয়। ছেলেদের ভাল করে শিক্ষা দিতে হলে বাবাদের আরও বেশি করে মদ খাওয়াতে হয়। এ তো হতে পারে না। তা ছাড়া, কংগ্রেস মাদকদ্রব্য বন্ধ করবার নীতিই গ্রহণ করেছে। মাদকবিক্রয়ের আয়ের উপর নির্ভর করে জাতিগঠনের কোন কাজের ব্যবস্থা করাই তার চলে না।

অন্য দেশের দৃষ্টান্ত দেখে লাভ নাই। ইউরোপ-আমেরিকার সমস্ত বড় বড় দেশই সাম্রাজ্যবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। একে তো

তাদের লোকসংখ্যা কম এবং কাজে-কাজেই শিক্ষার ব্যয়ও কম। তার উপর, অন্যান্য দেশকে শোষণ করে প্রচুর অর্থ তারা নিয়ে আসে। শিক্ষার জন্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যয় করতেও তাদের বাধে না। আমাদের দেশে সাত লক্ষ গ্রাম, লোকসংখ্যা পঁয়ত্রিশ কোটিরও উপর। তা ছাড়া, আমাদের সাম্রাজ্য নাই, সাম্রাজ্য স্থাপন করবার ইচ্ছাও নাই। অন্য দেশকে শোষণ করে অর্থসংগ্রহ করতে আমরা পারব না। সুতরাং আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের মত করে আমাদের নিজেদেরই গড়ে তুলতে হবে।

এই সমস্যা সকলকেই চিন্তিত করে তুলল। কেমন করে এর সমাধান করা যায়? সমাধানের পথ দেখালেন মহাত্মা গান্ধী। তিনি বললেন, এই দরিদ্র দেশে শিক্ষার জন্য যদি আমাদের টাকার উপর নির্ভর করতে হয় তা হলে আমাদের সারা জীবনেও আমরা কোনদিন দেশকে শিক্ষিত করতে পারব না। সেইজন্য আমার পরামর্শ হচ্ছে, শিক্ষাকে স্বাবলম্বী করতে হবে। শিক্ষা বলতে আমি বুঝি ছেলের দেহ মন প্রাণের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ। লিখতে পড়তে শেখাই শিক্ষা নয়, লেখাপড়া শিক্ষার একটা উপায় মাত্র। তাই একটা প্রয়োজনীয় শিল্প শিক্ষা দিয়েই আমি ছেলের শিক্ষা আরম্ভ করতে চাই। শিক্ষার প্রথম দিন থেকেই ছেলে উৎপাদন করতে শিখবে। উৎপন্ন জিনিস সরকার কিনে নেবেন। এইভাবে শিক্ষা স্বাবলম্বী হয়ে উঠবে।

ছেলে যদি যন্ত্রের মত কাজ না করে বুদ্ধিপূর্বক কাজ করে, কাজের প্রত্যেকটি প্রক্রিয়া কি উদ্দেশ্যে করা হচ্ছে এবং কেন করা হচ্ছে এ যদি তাকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়, তা হলে এই শিক্ষার ভিতর

দিয়েই ছেলের দেহ মনের পরিপূর্ণ বিকাশ হবে। এই শিক্ষায় শুধু যে ছেলে তার প্রয়োজনীয় সমস্ত জ্ঞানই লাভ করতে পারবে তা নয়, ছেলেবেলা থেকে কাজ করতে করতে সে কাজের লোক হয়ে উঠবে এবং শিক্ষাসমাপ্তির পর জীবিকানির্বাহের জন্য তাকে পরের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হবে না। প্রয়োজন হলে সে নিজের লব্ধ শিক্ষার সাহায্যেই নিজের জীবিকা অর্জন করতে পারবে। এই শিক্ষা ছেলের জীবনের সঙ্গে সম্বন্ধিত হবে এবং সেইজন্য শিক্ষা লাভ করে সে তার সমাজজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে না। শিক্ষার ফলে ছেলের সঙ্গে সঙ্গে তার সমাজও ক্রমে ক্রমে উন্নত হয়ে উঠবে।

মাতৃভাষার সাহায্যে এই শিক্ষা দেওয়া হবে। মাতৃভাষার ভিতর দিয়ে শিক্ষা দেওয়া হলে ছেলে সহজে অল্প সময়ে বেশি শিখতে পারবে। কষ্টকর বিদেশী ভাষার মাধ্যমে শিখতে গিয়ে যে সময় ও শক্তির অপচয় হয় তা আর হবে না।

প্রাথমিক শিক্ষাই জাতির জীবনে সকলের চেয়ে প্রয়োজনীয় শিক্ষা। অধিকাংশ দেশবাসীর ভাগ্যে এর চেয়ে বেশি শিক্ষা কোনদিনই জুটবে না। সেইজন্য অন্যূন সাতবৎসরব্যাপী শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে এবং শিক্ষার মান হবে ইংরেজী বাদে বর্তমান ম্যাট্রিকুলেশনের সমান।

গান্ধীজীর ভাষায় তাঁর এই 'বিপ্লবাত্মক প্রস্তাব' শিক্ষার জগতে একটা আলোড়নের সৃষ্টি করল। চারিদিকে এই নিয়ে তর্কবিতর্ক শুরু হয়ে গেল। অবশেষে এ সম্বন্ধে আলোচনার জন্য ওয়ার্ধায় বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্‌দের এক সম্মেলন আহ্বান করা হল। মহাত্মা গান্ধী

হলেন এই সম্মেলনের সভাপতি। এক সুদীর্ঘ বক্তৃতায় গান্ধীজী সম্মেলনের সম্মুখে তাঁর বক্তব্য উপস্থিত করলেন এবং ইতিমধ্যে এ সম্বন্ধে যে সমালোচনা হয়েছে তারও উত্তর দিলেন। অনেক আলোচনার পর সম্মেলনে এই প্রস্তাবগুলি গৃহীত হল ঃ

(১) এই সম্মেলন মনে করে যে, সমগ্র জাতির জন্য সাতবৎসর-ব্যাপী অবৈতনিক ও আবশ্যিক শিক্ষার ব্যবস্থা হওয়া উচিত।

(২) মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা হওয়া উচিত।

(৩) এই শিক্ষার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কোন একটা উৎপাদনাত্মক হাতের কাজকে কেন্দ্র করে শিক্ষা দেওয়া হবে এবং ছেলের পরিবেশের দিকে লক্ষ্য রেখে যে হাতের কাজকে কেন্দ্র-স্বরূপে গ্রহণ করা হবে, অন্যান্য সমস্ত শিক্ষা এবং অভ্যাস যথাসম্ভব তারই সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্বদ্ধ থাকবে, সম্মেলন গান্ধীজীর এই প্রস্তাব সমর্থন করছে।

(৪) এই শিক্ষা থেকে ক্রমশঃ শিক্ষকদের বেতন উঠে আসবে, এ কথা সম্মেলন স্বীকার করছে।

অতঃপর এই প্রস্তাব অনুসারে একটি পাঠ্যক্রম তৈয়ারি করে সম্মেলনের সভাপতি মহাত্মা গান্ধীর নিকট উপস্থিত করবার জন্য জামিয়া মিল্লিয়া ইসলামিয়ার অধ্যক্ষ ডাঃ জাকির হোসেনের সভা-পতিত্বে একটি কমিটি গঠন করা হল। কমিটি যথারীতি তাঁদের রিপোর্ট দাখিল করলেন। এই নূতন শিক্ষার নাম করলেন তাঁরা বেসিক্ এডুকেশন্ বা বুনিয়াদী শিক্ষা।

যথাসময়ে কংগ্রেসের সম্মুখে এই শিক্ষার প্রস্তাব উপস্থিত করা

হল। কংগ্রেস এই শিক্ষাকেই ভারতবর্ষের জাতীয় শিক্ষা বলে গ্রহণ করলেন এবং এর সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করবার জন্য একটি নিখিল ভারত শিক্ষা-সমিতি গঠন করবার নির্দেশ দিলেন। হিন্দুস্তানী তালীমী সংঘ নামে এই সমিতি গঠিত হল। ডাঃ জাকির হোসেন হলেন সেই সংঘের সভাপতি এবং ই. ডব্লিউ. আর্যনায়কম্ হলেন এর সম্পাদক। সংঘের তত্ত্বাবধানে এই শিক্ষার পরীক্ষার জন্য ওয়ার্ধার সন্নিকটে সেবাগ্রামে শ্রীযুক্ত আর্যনায়কম্ ও তাঁর সহধর্মিণী শ্রীযুক্তা আশা দেবীর নেতৃত্বে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হল। কংগ্রেস-শাসিত প্রদেশগুলিতে এই শিক্ষা প্রবর্তনের ব্যবস্থা করবার জন্য বিভিন্ন প্রদেশের শিক্ষাপরিচালকগণকে ওয়ার্ধায় আহ্বান করা হল। তিন সপ্তাহ ধরে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্‌গণ তাঁদের সঙ্গে এই শিক্ষার সম্বন্ধে আলোচনা করলেন। তারপর শিক্ষাপরিচালকেরা নিজের নিজের প্রদেশে ফিরে গিয়ে বুনিয়াদী শিক্ষার কাজ সুরু করলেন।

—দুই—

বুনিয়াদী শিক্ষা—কি ও কেন

গান্ধীজী মূলতঃ বিপ্লবী। রাজনীতির ক্ষেত্রে যেমন শিক্ষার ক্ষেত্রেও তেমনিই তিনি একটা বিপ্লবের সৃষ্টি করেছেন। তাঁর এই বৈপ্লবিক শিক্ষাপদ্ধতিই আজ বুনিয়াদী শিক্ষা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। বৈদেশিক শাসন থেকে দেশকে মুক্ত করাই তাঁর লক্ষ্য ছিল না। তাঁর লক্ষ্য ছিল দেশকে স্বাধীন এবং সবল মনুষ্যত্বে প্রতিষ্ঠিত করা। সেইজন্য তিনি রাজনৈতিক সংগ্রামের দিকে যতখানি নজর দিয়েছেন তার চেয়ে বেশি নজর দিয়েছেন জাতি-গঠনের দিকে। তাঁর জাতিগঠনাত্মক কর্মপন্থার একটা বড় অঙ্গ ছিল জাতীয় শিক্ষা। এই শিক্ষার ভিতর দিয়ে ভবিষ্যৎ ভারতীয় জাতিকে তিনি নূতন করে গড়তে চেয়েছিলেন, তাকে একটা নূতন রূপ দিতে চেয়েছিলেন।

তাঁর এই শিক্ষাপদ্ধতিকে ভাল করে বুঝতে হলে এর পিছনে তাঁর যে সমাজের কল্পনা ছিল তাকে বুঝতে হয়। আজকার সমাজে মানুষ এবং মানুষের মধ্যে একটা গভীর বৈষম্য রয়েছে। একদল লোক অপরকে শোষণ করে বড় হচ্ছে এবং আর একদল শোষিত হয়ে দিনের পর দিন নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছে। দেশের সমস্ত ধনসম্পদ্ কেন্দ্রীভূত হয়ে মুষ্টিমেয় শহরে জমা হচ্ছে এবং দেশের প্রাণকেন্দ্র-স্বরূপ তার গ্রামগুলি কর্মহীন এবং আনন্দহীন হয়ে ক্রমশঃ শুকিয়ে

যাচ্ছে। গান্ধীজী এই অবস্থার পরিবর্তন করতে চেয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন, শহরের ও গ্রামের এই অস্বাভাবিক সম্পর্ক দূর হয়ে গিয়ে একটা স্বাভাবিক ও স্বাস্থ্যকর সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হবে এবং ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে আজ যে দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান সৃষ্টি হচ্ছে তা ঘুচে গিয়ে একটা শ্রেণীহীন শোষণহীন সমাজ গড়ে উঠবে। তাঁর কল্পনা ছিল, তাঁর প্রবর্তিত এই শিক্ষাপদ্ধতি সমাজের মধ্যে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন নিয়ে আসবে এবং সমাজকে নূতনভাবে গঠিত করবে। তিনি বলেছেন ঃ "My plan........is thus conceived as the spear-head of a silent social revolution........It will provide a healthy and moral basis of relationship between the city and the village........and lay the foundation of a juster social order in which there is no unnatural division between the 'haves' and 'have-nots'."

সমাজের এক স্তর এবং আর এক স্তরের মধ্যে এই যে বৈষম্য, এর মূলে আছে শ্রম। একদল পরিশ্রম না করে বসে বসে খায় এবং আর একদল উদয়াস্ত মাথার ঘাম পায়ে ফেলে পরিশ্রম করতে বাধ্য হয়। এই বৈষম্য দূর করতে হলে সমস্ত সমাজকে শ্রমের উপর প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, বসে খেতে কেউই পাবে না। শিক্ষার ভিতর দিয়েই সমাজ গঠিত হয়। আমরা আমাদের ছেলেদের যেমনভাবে শিক্ষা দেব, আমাদের সমাজও তেমনিভাবেই গড়ে উঠবে। সেইজন্য সমাজকে যদি শ্রমের উপর প্রতিষ্ঠিত করতে হয়, তা হলে তার শিক্ষাকেও শ্রমের উপর প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এ ছাড়া উপায় নাই। গান্ধীজীও তাই করতে চেয়েছিলেন।

গান্ধীজীর প্রবর্তিত শিক্ষাপদ্ধতির গোড়ার কথা তাই হচ্ছে কাজ। সমাজজীবনের প্রয়োজনীয় উৎপাদনাত্মক কোন একটা কাজের ভিতর দিয়ে ছেলেকে শিক্ষা দিতে হবে। কাজ দিয়েই তার শিক্ষা আরম্ভ হবে এবং এই কাজের সাহায্যে প্রথম থেকেই সে সমাজের ধন উৎপাদনের কাজে সহায়তা করতে থাকবে। তিনি বলেছেন : "I would begin the child's education by teaching it a useful handicraft and enabling it to produce from the moment it begins its training." এই কাজ থেকে যে আয় হবে তার দ্বারা শিক্ষালয়ের ব্যয় নির্বাহিত হবে। শিক্ষালয় স্বাবলম্বী হবে, তাকে বাহিরের সাহায্যের ওপর নির্ভর করতে হবে না। তা ছাড়া, কাজের ভিতর দিয়ে শিক্ষালাভের ফলে ছেলে এমনভাবে তৈয়ারি হবে যে, শিক্ষাসমাপ্তির পর সে স্বাধীনভাবেই নিজের জীবিকানির্বাহ করতে সক্ষম হবে। উপার্জনের জন্য তাকে অন্যের মুখ চেয়ে বসে থাকতে হবে না।

শিশুশিক্ষার ক্ষেত্রে কাজের ভিতর দিয়ে শিক্ষা পৃথিবীর অন্যান্য দেশে আজ প্রবর্তিত হয়েছে। কাজ শিশুর প্রকৃতির অনুকূল। সে কিছু করতে চায়, এই তার স্বভাব। বসে বসে লিখতে পড়তে তার ভাল লাগে না। তার চেয়ে কাজের মধ্যে সে অনেক বেশি আনন্দ পায়। আর, এই আনন্দের ভিতর দিয়েই তার দেহ মন ও প্রাণের স্বাভাবিক বিকাশ হতে থাকে। প্রত্যেক ছেলের মনেই একটা সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা আছে। কাজের ভিতরে তার সেই আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হয়। উদ্দেশ্যহীন কাজ কখনও ভাল হয় না। সাধারণ শিক্ষালয়ে ছেলে যা শেখে, তার পিছনে কোন উদ্দেশ্য থাকে না। কিন্তু কর্মকেন্দ্রিক

শিক্ষায় ছেলে যা শেখে তা কাজের প্রয়োজনে শেখে। তার সমস্ত শিক্ষার পিছনেই একটা না একটা উদ্দেশ্য থাকে। সেইজন্য শিক্ষা ভাল হয়। ছেলে যা শেখে স্বাভাবিকভাবে আনন্দের সঙ্গে শেখে। ফলে, তাড়াতাড়ি শিখতে পারে এবং যা শেখে তা সহজে ভোলে না। এইসকল কারণে সর্বত্রই কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা দ্রুত প্রসারলাভ করছে।

কিন্তু সাধারণ কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা এবং গান্ধীজীর প্রবর্তিত শিক্ষার মধ্যে একটা পার্থক্য আছে। সাধারণ কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার কাজ যে-কোনরকম কাজ হতে পারে। সেই কাজ যদি ছেলের আগ্রহ জাগাতে পারে এবং তাতে যদি ছেলে আনন্দ পায় তা হলেই হল। কিন্তু গান্ধীজী-প্রবর্তিত শিক্ষায় এইটুকুকে যথেষ্ট বলে মনে করা হয় না। এখানে কাজ হবে সমাজের কল্যাণকর উৎপাদনাত্মক কাজ। এই কাজের একটা আর্থিক মূল্য থাকবে। এর থেকে আয় হবে এবং তাতে বিদ্যালয় পরিচালনার সহায়তা হবে।

আমাদের দেশের শতকরা ৮৬জন লোকই অশিক্ষিত। এই বিপুলসংখ্যক অশিক্ষিতকে শিক্ষা দেবার মত অর্থ এই দরিদ্র দেশে নাই। এদের শিক্ষিত করবার জন্য যদি আমাদের অর্থের অপেক্ষায় বসে থাকতে হয় তা হলে অনন্তকাল থাকতে হবে। কিন্তু শিক্ষা যদি ব্যয়সাধ্য না হয়, শিক্ষার খরচ যদি শিক্ষার ভিতর থেকেই উঠে আসে, তা হলে শিক্ষার সমস্যা সহজেই সমাধান করা যায়। অশিক্ষিতের সংখ্যা যতই হক না কেন, আমাদের তার জন্য ভাবতে হয় না।

এ ছাড়াও আর এক দিক থেকে সেই শিক্ষার একটা বিরাট সার্থকতা আছে। শিক্ষার ভিতর দিয়ে উপার্জন করতে করতে

ছেলের আত্মবিশ্বাস বাড়বে। সে বুঝবে, সে স্বাধীনভাবে নিজে নিজের পায়ের উপর দাঁড়াতে পারে, অপরের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকবার তার প্রয়োজন নাই। তার আত্মসম্মান বাড়তে থাকবে। সে অনুভব করবে, শিক্ষার জন্যও সে কারও উপর নির্ভর করে না, সে নিজের শিক্ষা নিজেই অর্জন করে। সে শারীরিক শ্রমকে উপযুক্ত মর্যাদা দিতে শিখবে এবং শারীরিক শ্রমে অভ্যস্ত হবে। তা ছাড়া, প্রত্যেক নাগরিকের যে সমাজের প্রতি একটা দায়িত্ব আছে এবং সেই দায়িত্ব পালন করেই যে তাকে তার অধিকার অর্জন করতে হয়, তাও সে বুঝতে আরম্ভ করবে।

তা হলেও, গান্ধীজী এই শিক্ষাকে যে রূপ দিতে চেয়েছিলেন শিক্ষাবিদ্‌রা তাকে ঠিক সেই রূপে গ্রহণ করেন নাই। শিক্ষার কেন্দ্রস্থানীয় কাজটি একটি উৎপাদনাত্মক শিল্প হবে, এ তাঁরা স্বীকার করেছেন ; কিন্তু এর স্বাবলম্বনের দিকটায় তাঁরা তেমন জোর দেন নাই। কেউ কেউ বলেছেন, কাজ যদি ভাল করে করা হয়—ভাল-ভাবে শিক্ষা যেখানে দেওয়া হবে সেখানে কাজও ভাল করে করা হবে, এটা ধরে নেওয়া যেতে পারে—তা হলে তার থেকে একটা আয় হবে এবং সেই আয় থেকে বিদ্যালয় পরিচালনার সহায়তা আপনা-আপনিই হয়ে যাবে। কেউ বা বলেছেন, ছেলেদের কাজ থেকে বিদ্যালয় পরিচালনার মত আয় হতে পারে না এবং হবে বলে আশা করাও উচিত নয়। গান্ধীজী নিজে কিন্তু এই স্বাবলম্বনের উপর খুব বেশি জোর দিয়েছেন। তাঁর মতে স্বাবলম্বন এই শিক্ষার একটা অপরিহার্য অঙ্গ। তিনি বলেছেন : "Such education.... must be self-supporting, in fact, self-support is the

acid test of its reality." গান্ধীজীর প্রবর্তিত শিক্ষাপ্রণালী যাঁরা গ্রহণ করবেন তাঁদের একথা ভুললে চলবে না যে, তাঁর মতে শিক্ষা শিল্পকেন্দ্রিক হওয়াই যথেষ্ট নয়, শিক্ষা স্বাবলম্বী হওয়াও অবশ্য প্রয়োজন।

শিক্ষাকে স্বাবলম্বী যাঁরা করতে চান তাঁদেরও অনেকের মনে একটা সংশয় আছে, শিক্ষাকে স্বাবলম্বী করা যায় কি না? শিক্ষার সমস্ত ব্যয় শিক্ষার থেকে নির্বাহ হবে, এতখানি অবশ্য প্রত্যাশা করা যায় না। শিক্ষালয়ের জমি, ঘরদুয়ার, সাজসরঞ্জাম, এই সকলের ব্যবস্থা সমাজকে বা রাষ্ট্রকে করে দিতে হবে। শুধু শিক্ষালয় পরিচালনার যে চলতি খরচ, যেমন শিক্ষকের বেতন এবং শিল্পের উপকরণের দাম, সেইটা শিক্ষার থেকে আসা প্রয়োজন। এইটুকু যে আসতে পারে তা বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরীক্ষার দ্বারা দেখা গেছে। তা ছাড়া, শিক্ষার প্রথম থেকেই যে তা থেকে শিক্ষালয় পরিচালনার মত আয় হবে তাও নয়। প্রথম এক বছর কি দু বছর যথেষ্ট আয় হবে না, কিন্তু তৃতীয় বছর থেকে হবেই; এবং শেষের দিকে কিছু বেশি আয় হবে। তার ফলে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সমস্ত শিক্ষা স্বাবলম্বী হয়ে যাবে। এর মধ্যে একটা কথা আছে, ছেলেদের শিল্পোৎপন্ন জিনিস ক্রয় করে নেবার দায়িত্ব সমাজ বা রাষ্ট্রকে নিতে হবে।

এই শিক্ষার কাল এবং মান নিয়েও আজ একটা সংশয়ের সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমানে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে যে শিক্ষা দেওয়া হয় তা মোটেই পর্যাপ্ত নয়। এইটুকু শিক্ষা নিয়ে সমাজজীবনে নাগরিকের কর্তব্য সুষ্ঠুভাবে পালন করবার মত ক্ষমতা ছেলের হয় না।

সেইজন্য শিক্ষার মান আরও উন্নত করা প্রয়োজন। গান্ধীজী চেয়েছিলেন যে, তাঁর প্রস্তাবিত শিক্ষার মান বর্তমান ম্যাট্রিকুলেশনের অনুরূপ হবে, শুধু ইংরেজী থাকবে না, এবং তার পরিবর্তে একটা বৃত্তি শিক্ষা দেওয়া হবে। এইটিই হবে প্রাথমিক শিক্ষা। এই শিক্ষা হবে সার্বজনিক, আবশ্যিক ও অবৈতনিক। তিনি বলেছেন ঃ "Primary education....covering all the subjects upto the matriculation standard, except English, plus a voction....should take the place of what passes today under the name of primary, middle and high school education." এই শিক্ষার কাল হবে সাত বৎসর। সাত বৎসর বয়সে ছেলে বিদ্যালয়ে প্রবেশ করবে এবং চৌদ্দ বৎসর বয়সে তার শিক্ষা সমাপ্ত হবে। সাত বৎসরে এতখানি শিক্ষা সম্ভব কি না সে সম্বন্ধে অনেকের সন্দেহ আছে। এই শিক্ষার কাল যে সাত বৎসরই হতে হবে এমন কোন কথা নাই। সাত বৎসর সময়টা গান্ধীজীর শিক্ষাব্যবস্থার অপরিহার্য অঙ্গ নয়। তিনি এই পরিমাণ শিক্ষা চান। এর জন্য যদি সাত বৎসরের বেশি সময় লাগে তো তাতেও ক্ষতি নাই। গান্ধীজী বলেছেন ঃ "Seven years are not an integral part of my plan. It may be that more time will be required to reach the intellectual level aimed at by me." তা হলেও সাত বৎসরে এই পরিমাণ শিক্ষা সম্ভব হতে পারে বলেই মনে হয়। বর্তমান ম্যাট্রিকুলেশন-স্কুলের ছেলেদের অনেকখানি সময়ই ইংরেজীর পিছনে চলে যায়। যদি ইংরেজীর বোঝা না থাকে এবং মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষা দেওয়া হয় তা হলে

ম্যাট্রিকুলেশনের অনুরূপ মোটামুটি শিক্ষা সাত বৎসরে দেওয়া যাবে। এই শিক্ষার যেটুকু পরীক্ষা এখন পর্যন্ত হয়েছে তা থেকে এই কথাই মনে হয়।

প্রকৃত শিক্ষা দিতে হলে ছেলেকে অনেক রকমের অনেক জিনিসই শেখাতে হয়। তার সবগুলিই একটা শিল্পের ভিতর দিয়ে শেখানো সম্ভব কি না, এ সম্বন্ধে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। সত্য সত্যই একটা মাত্র শিল্পকে অবলম্বন করে স্বাভাবিকভাবে সব জিনিস শেখানো যায় না। কিন্তু শিল্প যে একটাই শেখাতে হবে, এমন কিছু নয়। বরং প্রধানভাবে একটা শিল্প শেখানো হলেও আনুষঙ্গিকভাবে আরও অন্যান্য শিল্প শেখাবার ব্যবস্থাই এই শিক্ষায় আছে। ছেলেকে যথাসম্ভব স্বাবলম্বী করা এই শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। অন্ন বস্ত্র এবং গৃহ মানুষের প্রাথমিক প্রয়োজন। স্বাবলম্বী হওয়ার অর্থ এই প্রাথমিক প্রয়োজন নির্বাহ করবার শক্তি অর্জন করা। সেইজন্য কৃষি ও পশুপালন, সুতা কাটা ও কাপড় বোনা এবং কাঠের ও লোহার কাজ, এই সবগুলিরই কিছু কিছু ছেলেকে শেখানো আবশ্যক। তা ছাড়া, শিক্ষাকে যদি জীবনের সঙ্গে যুক্ত করতে হয় তা হলে ছেলের প্রাকৃতিক এবং সামাজিক পরিবেশকেও বাদ দেওয়া যায় না। এই সমস্তকে কেন্দ্র করেই শিক্ষা চলবে এবং কোন প্রয়োজনীয় জিনিসই শিক্ষার থেকে বাদ যাবে না।

প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠিত হবার পর ১৯৩৮ সালে কয়েকটি প্রদেশে সরকারীভাবে বুনিয়াদী শিক্ষা প্রবর্তিত হয়। কিছুদিন পরেই যুদ্ধ আরম্ভ হল এবং ইংরেজ-গবর্মেণ্টের সঙ্গে মতদ্বৈধের জন্য কংগ্রেস-মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে

অনেকগুলি প্রদেশেই বুনিয়াদী শিক্ষা বন্ধ হয়ে গেল। মাত্র দুই প্রদেশে পরীক্ষামূলকভাবে একটা সীমাবদ্ধ অঞ্চলে বুনিয়াদী শিক্ষা চলতে লাগল। যুদ্ধের পর কংগ্রেস-গবর্মেণ্ট পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলে আবার সর্বত্রই বুনিয়াদী শিক্ষা প্রবর্তিত হয়েছে। বাঙলা দেশে এতদিন পর্যন্ত সরকারীভাবে এ সম্বন্ধে কোন কিছু করা সম্ভব হয় নাই। কয়েকটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান কয়েক বছর হল কিছু কিছু কাজ করতে আরম্ভ করেছেন। স্বাধীনতা লাভের পর বাঙলা দেশে কংগ্রেস-গবর্মেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং এখানেও বুনিয়াদী শিক্ষাকে সরকারী শিক্ষানীতি হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু কাজ এখনও বেশি দূর এগোয় নাই।

১৯৩৮ সালে হরিপুরা অধিবেশনে কংগ্রেস জাতীয় শিক্ষানীতি স্বরূপে বুনিয়াদী শিক্ষাকে গ্রহণ করেন। সেইজন্য, ইচ্ছায় হক আর অনিচ্ছায় হক, প্রত্যেক প্রদেশেই গবর্মেণ্টকে বুনিয়াদী শিক্ষার নীতিকে স্বীকার করে নিতে হয়েছে। কিন্তু অবস্থা দেখে মনে হয়, সকলে এটাকে মনে প্রাণে গ্রহণ করতে পারেন নাই। বাঙলা দেশেও আজ এই অবস্থাই হয়েছে।

গান্ধীজীর মৃত্যুর পর আমরা বেশি করে তাঁর কথা ভাবতে আরম্ভ করেছি এবং তাঁর আদর্শকে সমাজের জীবনে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য নূতন করে সংকল্প করছি। আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে, বুনিয়াদী শিক্ষা গান্ধীজীর সামাজিক আদর্শের একটা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সকলের চেয়ে প্রয়োজনীয় অঙ্গ বললেও ভুল করা হবে না। আমরা যদি গান্ধীজীর আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করতে চাই, তাঁর এই শিক্ষাকেও আমাদের সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করতে হবে।

—তিন—

বুনিয়াদী শিক্ষার দার্শনিক ভিত্তি

সমস্ত শিক্ষাপদ্ধতির পিছনেই একটা দার্শনিক তত্ত্ব থাকে। তারই উপরে ভিত্তি করে শিক্ষাপদ্ধতি রচিত হয়। বুনিয়াদী শিক্ষার পিছনেও এমনই একটা দার্শনিক তত্ত্ব আছে। বুনিয়াদী শিক্ষার মূল কথাটা বুঝতে হলে এই দার্শনিক তত্ত্বটি বোঝা দরকার।

গান্ধীজী বুনিয়াদী শিক্ষার প্রবর্তক। গান্ধীজীর জীবনাদর্শের পিছনে যে দার্শনিক তত্ত্ব আছে, বুনিয়াদী শিক্ষার পিছনেও তাই আছে। গান্ধীজী অধ্যাত্মবাদী লোক। তাঁর কাছে মানুষের আত্মার একটা বিশিষ্ট মূল্য আছে। এই আত্মার পরিপূর্ণ বিকাশই তার জীবনের লক্ষ্য। মানুষকে তার এই লক্ষ্য যদি সিদ্ধ করতে হয় তা হলে যে সমাজে সে বাস করবে সেই সমাজকেও এর অনুকূল করে গড়তে হবে। সেই সমাজের গোড়ার কথা হবে, প্রত্যেকটি মানুষের পরিপূর্ণ স্বাধীনতা।

অবশ্য, কোন সমাজেই মানুষের পরিপূর্ণ স্বাধীনতা সম্ভব নয়। সমস্ত সমাজেই প্রত্যেক মানুষকে আর পাঁচজনের দিকে চেয়ে তার স্বাধীনতা অনেকখানি ক্ষুণ্ণ করতে হয়। তা না হলে সমাজজীবনই সম্ভব হয় না। কিন্তু এই যে নিজের স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ণ করা, এও মানুষ করবে নিজের ইচ্ছায় স্বাধীনভাবে। যে মানুষ নিজের স্বাধীনতাকে এইভাবে ক্ষুণ্ণ করতে চাইবে না, তার সমাজ ত্যাগ

করবার অধিকার থাকবে। আজও আমাদের দেশে সন্ন্যাসীদের তাই আছে।

যে সমাজে মানুষের পরিপূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে, সে সমাজের রূপও হবে অন্যরকম। বর্তমান সমাজের মত হবে না। এই সমাজে রাষ্ট্রিক বা আর্থিক শক্তি কেন্দ্রীভূত হয়ে কোন একটা জায়গায় থাকবে না, থাকবে সমস্ত সমাজের সর্ব অঙ্গে সকলের মধ্যে ছড়িয়ে। এই বিকেন্দ্রিত সমাজে বৃহৎ যন্ত্রশিল্পের কেন্দ্রীভূত উৎপাদন-ব্যবস্থা থাকবে না, অথবা থাকলেও সমাজজীবনে তার স্থান হবে নিতান্তই গৌণ। স্বল্পায়তন পল্লীশিল্পই হবে এই সমাজের উৎপাদনব্যবস্থার প্রধান অঙ্গ। এই পল্লীশিল্পকে অবলম্বন করে একএকটি ছোট পল্লীসমাজ গড়ে উঠবে। এই পল্লীসমাজগুলি হবে স্বাধীন, স্বাবলম্বী এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ। এই বিকেন্দ্রিত সমাজে বৃহৎ যন্ত্রশিল্পের মত কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রিক শক্তির আধার স্টেট বা রাষ্ট্রও থাকবে না, কিংবা থাকলেও তার হাতে ক্ষমতা থাকবে অত্যন্ত অল্প। সমাজের বিভিন্ন অঙ্গের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা ছাড়া তার আর বিশেষ কোন কাজ থাকবে না।

এই সমাজ মানুষের পারস্পরিক সদিচ্ছা এবং সহযোগিতার উপর প্রতিষ্ঠিত হবে, বর্তমান সমাজের মত জোর এবং প্রতিযোগিতার উপর নয়। এই সমাজে বিনা শ্রমে বসে খাবার লোক কেউ থাকবে না। সঞ্চয় তারাই করে, যারা বসে খেতে চায়। সেইজন্য এই সমাজে সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি কারও থাকবে না, সৃজনের প্রবৃত্তিই হবে সেখানে বড়। এই সমাজে একদল লোক পরিশ্রম করবে না, এও যেমন হবে না, তেমনই একদল লোক শুধু মানসিক শ্রম করবে এবং

আর একদল শুধু শারীরিক শ্রম, এও থাকবে না। সকল শ্রমই সেখানে সমান বলে গণ্য হবে। সুতরাং ছোটবড় এবং উচ্চনীচের ভেদ সেখানে থাকবে না। সকলেই হবে সকলের সঙ্গে সমান। এই সমাজ হবে সম্পূর্ণ শোষণমুক্ত শ্রেণীহীন সমাজ।

শিক্ষার লক্ষ্য হল মানুষ তৈয়ারি। মানুষ সামাজিক জীব। সেইজন্য মানুষ তৈয়ারির কথা ভাবতে গেলেই সঙ্গে সঙ্গে তার সমাজের কথাও ভাবতে হয়। শিক্ষার ভিতর দিয়ে আমরা যে মানুষ তৈয়ারি করব সে মানুষ কোন্ সমাজের মানুষ হবে, এইটা স্থির করতে না পারলে আমাদের শিক্ষাপ্রণালী স্থির হবে না। সেইজন্য সমস্ত শিক্ষাপ্রণালীই একটা বিশিষ্ট সমাজতত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। বুনিয়াদী শিক্ষা যে সমাজতত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত সে হচ্ছে গান্ধীজীর পরিকল্পিত ও বিকেন্দ্রিত শ্রেণীহীন সমাজ।

কোন একটা সমাজজীবনের জন্য ছেলেকে তৈয়ারি করতে হলে সেইরকম সমাজ গঠনই হল তার উপায়। সাঁতার দিয়েই সাঁতার শিখতে হয়। জীবনের ভিতর দিয়েই জীবনের জন্য প্রস্তুত হতে হয়। সেইজন্য আমরা যেরকম সমাজ চাই আমাদের শিক্ষালয়কেও সেইরকম সমাজের মত করে গড়তে হবে। শিক্ষালয়ও হবে একটা সমাজ, এবং আমাদের পরিকল্পিত সমাজের মত সমাজ। সাধারণ সমাজ বয়স্কদের সমাজ, বয়স্কদের মত করে তৈয়ারি। শিক্ষালয়-সমাজ সাধারণ সমাজের অনুরূপ হলেও সে ছেলেদের সমাজ, এবং সেই সমাজ তৈয়ারি হবে ছেলেদের মত করে। শিক্ষালয়-সমাজের অঙ্গীভূত হয়ে সেই সমাজজীবন যাপন করতে করতে ছেলে সাধারণ বয়স্ক-সমাজের জন্য তৈয়ারি হবে। এইখানেই শিক্ষালয়ের সার্থকতা।

বুনিয়াদী শিক্ষার লক্ষ্য হল গান্ধীজীর পরিকল্পিত এই সমাজের জন্য ছেলেকে তৈয়ারি করা। এই শিক্ষার ভিতর দিয়ে ছেলে ভবিষ্যতের শোষণমুক্ত শ্রেণীহীন সমাজের স্বাধীন এবং স্বাবলম্বী নাগরিক স্বরূপে গড়ে উঠবে। সেইজন্য বুনিয়াদী শিক্ষালয়ের সমাজও হবে এই সমাজের অনুরূপ। বুনিয়াদী শিক্ষালয়ে ছেলে একটা সমাজজীবন যাপন করবে এবং সেই সমাজের ভিত্তি হবে পারস্পরিক সহযোগিতার উপর প্রতিষ্ঠিত সৃজনাত্মক শ্রম।

সেই জন্য বুনিয়াদী শিক্ষার গোড়ার কথা হল সৃজনাত্মক কাজ। এই কাজের ভিতর দিয়ে মানুষ হতে হতে ছেলে আপনা-আপনি ভবিষ্যৎ সমাজের নাগরিক হবার মত গুণ অর্জন করতে থাকবে। পড়াশোনা একলা একলাও করা যায়; কিন্তু কাজ করতে গেলেই পাঁচজনের সহযোগিতার প্রয়োজন হয়। কাজের ভিতর দিয়ে ছেলের সৃজনের ক্ষমতা যতই বিকাশ লাভ করে, তার সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি ততই কমতে থাকে। কাজ করতে করতে কাজের প্রতি ছেলের শ্রদ্ধা জাগে। যতই সে কাজে অভ্যস্ত হয় ততই কাজের ভিতর একটা আনন্দ পেতে থাকে এবং বসে খাবার প্রবৃত্তি তার কমে যায়। এইভাবে ছেলের মনে প্রতিযোগিতার প্রবৃত্তির পরিবর্তে সহযোগিতার প্রবৃত্তি, সঞ্চয়ের প্রবৃত্তির পরিবর্তে সৃজনের প্রবৃত্তি এবং সঙ্গে সঙ্গে শ্রমের সম্বন্ধে মর্যাদাবোধ জেগে ওঠে। ছেলে যে কাজ করে তার একটা মূল্য আছে, কাজের ভিতর দিয়ে সে সমাজের সেবাও করে যায়। এর ফলে সমাজের প্রতি তার দায়িত্ববোধ জাগে। সে অনুভব করে, সেও সমাজের একটা প্রয়োজনীয় অঙ্গ এবং অমনি সঙ্গে সঙ্গে তার আত্মসম্মানজ্ঞানও বেড়ে যায়। যদিও

কাজের ফলে স্বাভাবিকভাবেই এইসব হবার কথা; তবু শিক্ষককে কাজের ক্ষেত্র এমন করে রচনা করতে হবে যেন তার ফলে ছেলের পক্ষে এইসব গুণ অর্জন করা সহজ হয়। তার মানে, শিক্ষককে ছেলেদের জন্য নূতন সমাজের অনুরূপ একটা শিক্ষালয়-সমাজ শিক্ষালয়ের ভিতর গড়ে তুলতে হবে। এই হবে শিক্ষকের কাজ, এবং এইখানেই হবে তার কৃতিত্ব।

কাজের ভিতর দিয়ে শিক্ষার একটা মনস্তাত্ত্বিক উপযোগিতা আছে। সেইজন্য বালশিক্ষার ক্ষেত্রে অনেকেই আজ কাজের মাধ্যমে শিক্ষার কথা ভাবছেন। প্রজেক্ট্ মেথড্এর একটা প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কিন্তু প্রজেক্ট্ মেথড্ এবং বুনিয়াদী শিক্ষার ভিতর একটা বড় পার্থক্য এই যে, বুনিয়াদী শিক্ষার যে সমাজতাত্ত্বিক ভিত্তি আছে, প্রজেক্ট্ মেথডের তা নেই। প্রজেক্ট্ মেথড্ শুধু বালমনস্তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে রচিত। বুনিয়াদী শিক্ষার পিছনে এই বালমনস্তত্ত্ব তো আছেই, তা ছাড়া, গান্ধীজী পরিকল্পিত সমাজের সমাজতত্ত্বও আছে। সেইজন্য প্রজেক্ট্ মেথডের কাজ যে-কোন কাজ হলেই চলে, বুনিয়াদী শিক্ষার কাজ সমাজের পক্ষে প্রয়োজনীয় উৎপাদনাত্মক কাজ হওয়া চাই।

এই উৎপাদনাত্মক কাজের আরও একটা দিক থেকে মূল্য আছে। এই কাজের থেকে যে জিনিস তৈয়ারি হবে তা বাজারে বিক্রয় করা চলবে এবং তার থেকে একটা আয় হবে। এই আয় থেকে অন্ততঃ আংশিকভাবে স্কুলের ব্যয় নির্বাহ হবে। আমাদের মত গরিব দেশে, যেখানে অশিক্ষিতের সংখ্যা এত বেশি, এর মূল্য বড় কম নয়। এ না হলে আমাদের কোটি কোটি অশিক্ষিত

ছেলেমেয়েকে শিক্ষিত করতে এক শ বছর লেগে যাবে। কিন্তু ততদিন অপেক্ষা করবার মত সময় আমাদের নেই।

বুনিয়াদী শিক্ষার এই মনস্তাত্ত্বিক এবং আর্থিক উপযোগিতা, এ দুইই খুব বড় জিনিস। তা হলেও এই দুটি এর মূল কথা নয়। এর সবচেয়ে বড় কথাই হল, এর সমাজতাত্ত্বিক উপযোগিতা। বুনিয়াদীশিক্ষাব্রতীদের এই বিষয়ে সচেতন থাকা প্রয়োজন, কারণ এ না হলে বুনিয়াদী শিক্ষা বুনিয়াদী শিক্ষাই হল না। বুনিয়াদী শিক্ষা শুধু শিক্ষারই বুনিয়াদ নয়, আমরা আমাদের ভবিষ্যদ্‌বংশীয়দের জন্য যে সমাজ রচনা করতে চাই তারও বুনিয়াদ, এ কথাটা ভুললে চলবে না।

—চার—

বুনিয়াদী শিক্ষার মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি

সাধারণ শিক্ষার ক্ষেত্রে হাতের কাজ এবং লেখাপড়াকে পৃথক করে দেখা হয়। ও দুটো ভিন্ন জিনিস এবং ওর একটার সঙ্গে আর একটার কোন সম্বন্ধ নাই, এই হল প্রচলিত ধারণা। বুনিয়াদী শিক্ষা এ ধারণার বিরোধী। বুদ্ধির বিকাশের দিক থেকে এ দুইই সমান, বরং হাতের কাজই এ বিষয়ে বেশি উপযোগী, বুনিয়াদী শিক্ষার এই মত। সেইজন্য এই শিক্ষাপদ্ধতিতে হাতের কাজকে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। শুধু সাধারণ শিক্ষার নয়, বৌদ্ধিক শিক্ষারও বটে। এ শিক্ষার মতে, হাতের কাজই একটা শিক্ষা, তার ভিতর দিয়েই ছেলের শরীর মন এবং চরিত্রের বিকাশ হতে পারে। তবে তার চেয়েও বড় কথা হল, হাতের কাজকে অবলম্বন করে যদি লেখাপড়া শেখানো যায় তো লেখাপড়া আরও ভাল হয়।

বুনিয়াদী শিক্ষা একটা দৃঢ় মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, এ কথা খুবই সত্য। তবে সে সম্বন্ধে আলোচনা করবার পূর্বে মনস্তত্ত্বের দিক থেকে হাতের কাজের অর্থাৎ সৃজনাত্মক কাজের কি মূল্য সেইটাই প্রথমে বিচার করে দেখা যাক।

মনস্তত্ত্ববিদ্‌দের মতে, তলিয়ে দেখলে দেখা যায়, ছেলেদের হাতের কাজ তাদের সহজ কর্মপ্রবৃত্তিরই একটা প্রকাশ। আর্নেস্ট্ জোন্‌স্ বলেন, মনস্তত্ত্বের কথায় বলতে গেলে, একটা সহজাত প্রবৃত্তি

যখন তার নিজস্ব বিশিষ্টরূপে প্রকাশ পেতে পারে না, তখন তিন রকমে নিজেকে প্রকাশ করে ঃ

(১) সামাজিক। সমাজের দিক থেকে এর মূল্য আছে। সহজাত প্রবৃত্তির উন্নয়ন ও রূপান্তরীকরণের ফলেই এটা হয়।

(২) নিঃসামাজিক। সমাজের দিক থেকে এর কোন মূল্য নাই। বিভিন্ন মানসিক ব্যাধিগুলি এর দৃষ্টান্তস্থল। সহজাত প্রবৃত্তির রূপান্তরীকরণ যেখানে পুরাপুরি সম্ভব হয় না, সেখানেই এটা হয়ে থাকে।

(৩) অসামাজিক। সহজাত প্রবৃত্তির রূপান্তরীকরণের অক্ষমতাই এর কারণ।

এই মত অনুসারে কাজ আমাদের সহজাত প্রবৃত্তিরই একটা প্রকাশ। মানসিক স্বাস্থ্যের এবং সমাজের কল্যাণের দিক থেকে এর বিশেষ মূল্য আছে। সহজ কর্মপ্রবৃত্তি ছেলেদের খুব বেশি এবং সে প্রবৃত্তি নিজেকে প্রকাশ করবেই। সেইজন্য শিক্ষার ক্ষেত্রে এই প্রবৃত্তির প্রকাশের এমন পথ যদি করে দিতে পারা যায় যাতে ছেলের এবং সমাজের দুইয়েরই কল্যাণ হয় তা হলে ভাল হয়। লেখাপড়ার ভেতর দিয়েও ছেলের এই কর্মপ্রবৃত্তি পরিতৃপ্ত হতে পারে, তবে লেখাপড়ায় বেশি শক্তি ব্যয় হয় না। কর্মপ্রবৃত্তি দুইভাবে নিজেকে পরিতৃপ্ত করতে পারে—এক কাজের ভিতর দিয়ে, আর এক চিন্তার ভিতর দিয়ে। কাজের ভিতর দিয়ে পরিতৃপ্তির যে পথ সেইটাই প্রত্যক্ষ ও মৌলিক এবং এতেই বেশি শক্তির ব্যয় হয়। চিন্তার ভিতর দিয়ে পরিতৃপ্তি তা নয়। এই পথে অন্যের কাজকে অবলম্বন করে পরোক্ষভাবে কাজ হয় এবং সেইজন্য এতে অতখানি শক্তি ব্যয়

হয় না। ব্যক্তির জীবনে এর স্থান কাজের পরে। চিন্তায় যথেষ্ট শক্তির ব্যয় হয় না বলে চিন্তার ভিতর দিয়ে ছেলের স্বাভাবিক কর্মপ্রবৃত্তির সম্পূর্ণ পরিতৃপ্তি হয় না। কাজের ভিতর দিয়ে শরীর এবং মনের স্বাভাবিক কর্মপ্রবৃত্তি শুধু যে বেশি পরিতৃপ্ত হয় তাই নয়, আরও সহজে পরিতৃপ্ত হয়। সেইজন্য ছেলেরা পড়াশোনার চেয়ে কাজ বেশি ভালবাসে।

আরও একটু তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে, গঠনাত্মক কাজ ছেলের জীবনের একটা বড় অভাব পূর্ণ করে। ভাঙবার এবং নষ্ট করবার ইচ্ছাও ছেলেদের মনে আছে। অনেক সময় সে ইচ্ছাটা এত বেশি হয় যে, ছেলে নিজের মনে নিজেকে অপরাধী বলে ভাবতে থাকে। এতে তার মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়। গঠনাত্মক কাজ তার এই ধ্বংসের প্রবৃত্তির সংশোধক হিসাবে কাজ করে এবং সেইজন্য ছেলের মনের স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখতেও সাহায্য করে।

তা ছাড়া, ছেলের মনে সৃজনের একটা আকাঙ্ক্ষা আছে। কাজের ভিতর দিয়ে তার এই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়। সে এমন একটা জিনিস তৈয়ারি করতে পারে যার উপর তার ব্যক্তিত্বের ছাপ থাকে। এইভাবে হাতের কাজ ছেলের ব্যক্তিত্বের বিকাশের সহায়তা করে।

এইবার ছেলে কাজের ভিতর দিয়ে কেমন করে শিক্ষালাভ করে তা দেখা যাক। শিক্ষার প্রেরণা বই পড়ার চেয়ে কাজ থেকেই বেশি আসে। কাজ করতে করতে কাজের প্রয়োজনেই ছেলের মনে শিক্ষার আগ্রহ জাগে। একটা দৃষ্টান্ত দিলে আমাদের বক্তব্যটি পরিষ্কার হবে। এক দুই তিন করে গোণায় তালে তালে উচ্চারণ

করার একটা আনন্দ আছে। তা ছাড়া, শুধু গোণার জন্য গোণার কোন অর্থ নেই ছেলের কাছে। কিন্তু যখন সে কোন কাজ করে এবং কাজের প্রয়োজনেই তাকে গুণতে হয়, তখন গুণতে শেখা তার কাছে আরও সহজ এবং স্বাভাবিক হয়।

বুনিয়াদী শিক্ষায় শিক্ষা এবং যার প্রয়োজনে ছেলে শিখবে সেই কাজ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। কাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে শিক্ষা দিতে গেলে ছেলের কাছে সেই শিক্ষার কোন অর্থ থাকে না। তাই ছেলের মন সেই শিক্ষার প্রতি বিমুখ হয়ে পড়ে। মানুষ যেখানে স্বেচ্ছায় নিজের আগ্রহে শেখে সেইখানেই তার শিক্ষা ভাল হয়। ছেলেদের ক্ষেত্রেও তাই। ছেলের মনে যদি শিক্ষার আগ্রহ জাগাতে পারা যায় এবং সে নিজের আগ্রহেই শিখতে চায় তা হলে সে আরও ভাল করে শিখতে পারে।

পুরাতন প্রথায় ছেলের শিক্ষার আগ্রহ থাকে না এবং বুনিয়াদী প্রথায় থাকে, এ নয়। ঠিক ঠিক বলতে গেলে, পুরাতন প্রথার চেয়ে বুনিয়াদী প্রথায় ছেলের আগ্রহ বেশি থাকে। প্রচলিত প্রথায় পদে পদেই ছেলের স্বাভাবিক প্রকৃতি বাধা পায় এবং তার ফলে ছেলের শিক্ষার ইচ্ছা কমে যায়। শিক্ষার বিষয়ে তার ইচ্ছার চেয়ে অনিচ্ছাই সেখানে বেশি হয়। বুনিয়াদী শিক্ষা ছেলের স্বাভাবিক প্রকৃতিকে অনুসরণ করে চলে। সেইজন্য এই শিক্ষায় ছেলের ইচ্ছা বেশি হয়, অনিচ্ছা কমে যায়।

শিক্ষার ক্ষেত্রে ইচ্ছা এবং অনিচ্ছা অনেক দিক দিয়ে কাজ করে। প্রথমতঃ, শিখবার ইচ্ছা থাকলে অল্প সময়ে শিখতে পারে এবং বেশি শিখতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, ইচ্ছা করে যা শেখা যায় তা বেশিদিন

মনে থাকে। ফ্রয়েড্ বলেছেন, আমরা ইচ্ছা করে ভুলি, আমরা সেইটাই ভুলি যেটা আমরা ভুলতে চাই। ভাল না লাগাই অবশ্য আমাদের এই চাওয়ার কারণ, এবং এটা আমাদের অজ্ঞাতসারে আমাদের নির্জ্জান মনের মধ্যেই ঘটে। মনে রাখার সম্বন্ধেও সেই একই কথা। আমরা যেটা মনে রাখতে চাই তা আমাদের মনে থাকে। সেইজন্য ছেলে যখন ইচ্ছা করে শেখে, সে শিক্ষণীয় বিষয়ের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে দেয় এবং তার ফলে এই শিক্ষা তার জীবনের অঙ্গীভূত হয়ে পড়ে। ছেলেরা যখন তাদের শিক্ষাকে স্বচ্ছন্দে ইচ্ছা-মত কাজে লাগায় তখন তা থেকে এরই পরিচয় পাওয়া যায়।

এই প্রসঙ্গে কিল্‌প্যাট্রিক্ যাকে 'আনুষঙ্গিক শিক্ষা' বলেছেন তার কথাও আমাদের ভাববার আছে। সত্যকার শিক্ষিত লোকের মনে শিক্ষার জন্য একটা আগ্রহ থাকে। ছেলেদের তো কৌতূহলের অন্ত নাই। কিন্তু যখন তাদের অনিচ্ছাসত্ত্বে শিখতে হয় তখন তাদের এই কৌতূহল চলে যায় এবং তার জায়গায় শিক্ষার প্রতি একটা বিরাগ এসে উপস্থিত হয়। প্রচলিত প্রথায় শিক্ষিত লোক-দের মধ্যে অনেক সময়েই শিক্ষার প্রতি এইরকম বিরাগ দেখা যায়। বুনিয়াদী প্রথা যে প্রচলিত প্রথার চেয়ে এ বিষয়ে ভাল হবে তা মনে করবার যথেষ্ট কারণ আছে।

এইসকল কারণে বইয়ের ভিতর দিয়ে শিক্ষার চেয়ে কাজের ভিতর দিয়ে শিক্ষায় অন্য ক্ষেত্রে শিক্ষার প্রয়োগ সহজ হবে। জীবনের অঙ্গ হিসাবে কাজের ভিতর দিয়ে যে শিক্ষালাভ হয় সে শিক্ষা যে বেশি উদ্দেশ্যমূলক হয় তাই নয়, সেই শিক্ষার সার্থকতাও ছেলের কাছে বেশি পরিস্ফুট হয়ে থাকে। সেইজন্য এই শিক্ষা

আরও ভাল শিক্ষা এবং কাজের দিক থেকে আরও বেশি শিক্ষা, এই কথা বললে অন্যায় হবে না।

আমাদের এই আলোচনা থেকে স্পষ্টই বোঝা যাবে যে, মনস্তত্ত্বের দিক দিয়ে বুনিয়াদী শিক্ষা সম্পূর্ণ শাস্ত্রসম্মত। তবে, কার্যক্ষেত্রে বুনিয়াদী শিক্ষায় কয়েকটি বিপদ আছে। বুনিয়াদী শিক্ষার ব্যবস্থাপকদের সেগুলি এড়িয়ে চলতে হবে। কাজের ভিতর দিয়ে ছেলের সহজ কর্মপ্রবৃত্তি রূপান্তরিত হয়। কিন্তু এই সহজ প্রবৃত্তি সব ছেলের একরকম নয়। তা ছাড়া, আর্ণেস্ট্ জোনসের কথায় বলতে গেলে, সহজ প্রবৃত্তির উন্নয়ন ও রূপান্তরীকরণ তো ইচ্ছা করলেই করা যায় না। বিভিন্ন ছেলের সহজ প্রবৃত্তির প্রকাশ যখন বিভিন্ন, তখন ছেলেদের জন্য বিভিন্নরকম কাজের ব্যবস্থা করাই উচিত। ছেলেকে তার ইচ্ছামত কাজ বেছে নেওয়ার সুযোগ দেওয়া দরকার। সেইজন্য বুনিয়াদী শিক্ষায় যদি বিভিন্নরকম কাজের ব্যবস্থা করা হয়, অথবা যে কাজের ভিতর বিভিন্ন প্রক্রিয়ার প্রয়োজন এমন কোন একটা কাজের ব্যবস্থা করা হয়, তা হলে ভাল হয়। এই দুইরকম ব্যবস্থার মধ্যে প্রথমটিই ভাল, বিশেষ করে শিক্ষার প্রথম দিকে।

প্রচলিত শিক্ষার চেয়ে বুনিয়াদী শিক্ষায় শিক্ষক ও ছাত্রের সম্পর্ক বেশি ঘনিষ্ঠ হয়। এটা একদিক থেকে ভালই। তবে, এর আবার বিপদও আছে। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে ছাত্রের উপর শিক্ষকের প্রভাব আরও বেশি পড়ে। সেইজন্য প্রচলিত শিক্ষার চেয়ে বুনিয়াদী শিক্ষায় শিক্ষকদের মানুষ হিসাবে আরও ভাল হওয়া প্রয়োজন। তা না হলে ছেলেদের ক্ষতি হবার সম্ভাবনা আছে।*

* শ্রীযুক্ত অনাথনাথ বসুর ইংরেজী প্রবন্ধ থেকে অনূদিত।

—পাঁচ—

বুনিয়াদী শিক্ষার আর্থিক দিক

কাজের ভিতর দিয়ে শিক্ষা দেওয়া হবে এবং সেই শিক্ষা স্বাবলম্বী হবে অর্থাৎ কাজের আয় থেকেই শিক্ষার ব্যয়নির্বাহ হবে—এই ছুটিই বুনিয়াদী শিক্ষার গোড়ার কথা। এর মধ্যে প্রথমটির সম্বন্ধে শিক্ষাবিদ্‌দের আপত্তি নাই। কাজের ভিতর দিয়ে শিক্ষা দেবার নীতি আজ পৃথিবীর সর্বত্রই প্রগতিশীল শিক্ষাব্রতীদের দ্বারা গৃহীত হয়েছে।

আপত্তি উঠেছে দ্বিতীয়টি নিয়ে। ভারত-গবর্মেণ্টের কেন্দ্রীয় শিক্ষা-পরামর্শ-সমিতি প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বুনিয়াদী শিক্ষার নীতিকে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু শিক্ষা স্বাবলম্বী হবে, এই কথাটা তাঁরাও স্বীকার করতে পারেন নাই। কেউ কেউ নীতি হিসাবেই স্বাবলম্বনকে গ্রহণ করতে চান না। তবে অধিকাংশের আপত্তি নীতিগত নয়। তাঁরা একে সম্ভব বলে মনে করেন না।

প্রথমেই বলা প্রয়োজন, শিক্ষার প্রাথমিক ব্যয় শিক্ষার থেকে নির্বাহিত হবে, এতখানি দাবী করা হচ্ছে না। বিদ্যালয়ের জমি কেনা, ঘর তৈয়ারি করা, সাজসরঞ্জাম প্রস্তুত করা প্রভৃতির জন্য যে খরচ তা শিক্ষার ভিতর থেকে উঠতে পারে না, এ কথা স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। বিদ্যালয়ের চলতি খরচ এবং প্রধানত শিক্ষকের বেতন শিক্ষার থেকে উঠবে, এই হল কথা। সেটা সম্ভব কি না, এইটাই প্রশ্ন।

বুনিয়াদী শিক্ষায় শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে অনেকরকম কাজের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তার মধ্যে প্রধান স্থান দেওয়া হয়েছে সুতা কাটা ও কাপড় বোনাকে। তার কারণ, এটি অপেক্ষাকৃত অল্পব্যয়-সাধ্য এবং শিক্ষাবিদ্‌দের মতে বিভিন্ন বিষয় শিক্ষা দেবার সুযোগ এতেই সকলের চেয়ে বেশি। তা ছাড়া, আরও একটা কথা আছে। সমাজজীবনের প্রয়োজনীয় কোন একটা শিল্পকেই শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করা হবে, এই হল কথা। অন্ন বস্ত্র এবং গৃহ, এই তিনটি মানুষের জীবনে সকলের চেয়ে বেশি প্রয়োজনীয়। তার মধ্যে দেশের বর্তমান অবস্থায় বস্ত্রের প্রয়োজনই হয়েছে সবচেয়ে বেশি। এইজন্য আমাদের জাতীয় জীবনে গান্ধীজী সূতা কাটার উপর এত বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এ ছাড়াও সুতা কাটা এমন একটা শিল্প যা সকল স্থানে সকল সময়ে সকল অবস্থাতেই করা যেতে পারে। ছোট ছেলের পক্ষে সমাজের কল্যাণকর সমস্ত কাজের মধ্যে সুতা কাটাই বোধ হয় সকলের চেয়ে সহজ। তাই অধিকাংশ স্কুলে এইটিকেই শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। বাঙলা দেশে এ পর্যন্ত যত বুনিয়াদী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার সবগুলি-তেই আনুষঙ্গিক শিল্প হিসাবে অন্য কাজের ব্যবস্থা থাকলেও মূল শিল্প স্বরূপে সুতা কাটা, কাপড় বোনাকেই নেওয়া হয়েছে।

প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত সুতা কাটা হয়। প্রথম শ্রেণীতে সুতা কাটা আরম্ভ হয় টাকু দিয়ে। টাকুতে বেশি সুতা হয় না। তা ছাড়া, সুতা কাটা ও তৎসংক্রান্ত অন্যান্য কাজের কৌশল আয়ত্ত করাতেই এই বছরের বেশির ভাগ সময় চলে যায়। সেইজন্য এই শ্রেণীতে আয় বিশেষ কিছু হয় না। সাধারণত দ্বিতীয় শ্রেণীতে

চরকা দেওয়া হয়। কিন্তু চরকায় অভ্যস্ত হতে ছেলের কিছুটা সময় লাগে। কাটার গতিও প্রথম প্রথম অল্প থাকে। তাই এ শ্রেণী-তেও—বিশেষ করে প্রথম ছয় মাসে—যেমন আয় হওয়ার কথা তা হয় না। তৃতীয় শ্রেণীতে ছেলেরা যখন ওঠে, তখন সূতা কাটায় তারা অভ্যস্ত হয়েছে। সেই সময়ে সুতা কাটার থেকে মাসে একটা শ্রেণীতে কত আয় হতে পারে তারই একটা হিসাব নীচে দেবার চেষ্টা করছি। পরবর্তী শ্রেণীতে আয় এর চেয়ে বেশি হবারই কথা। ষষ্ঠ ও সপ্তম (এবং সার্জেণ্ট-পরিকল্পনা অনুযায়ী যেখানে আটটি শ্রেণী আছে সেখানে অষ্টম) শ্রেণীতে তাঁত বোনা হয়। তার আয় সুতা কাটার আয়ের চেয়ে অনেক বেশি।

তৃতীয় শ্রেণীতে দৈনিক মোট কাজের সময় হবে ৩ ঘণ্টা। তার মধ্যে তুলা তৈয়ারি করার জন্য লাগবে ১ ঘণ্টা, বাকি ২ ঘণ্টা সুতা কাটা চলতে পারবে। ঘণ্টায় ১৪ নম্বরের সুতা ৩১৫ গজ করে কাটা শক্ত নয়। এই হিসাবে কাটলে ২ ঘণ্টায় সুতা হবে ৬৩০ গজ অর্থাৎ ৩/৪ গুণ্ডি। (১ গুণ্ডি=৮৪০ গজ)

আমরা ধরে নিচ্ছি, বৎসরে ৯ মাস কাজ হবে এবং ৩ মাস ছুটি থাকবে। ৯ মাস মানে ২৭৩৩/৪ বা মোটামুটি ২৭৪ দিন। ৩৯টা রবিবার বাদ দিলে হয় ২৩৫ দিন। তাতে গড়ে মাসে কাজের দিন হয় ১৯৭/১২ বা মোটামুটি ২০।

নিখিল ভারত চরকা-সংঘের দর অনুসারে ১৪ নম্বরের ১ গুণ্ডি সুতার দাম ৶০ আনা। কাজেই ৩/৪ গুণ্ডির দাম ৵৫ আনা। এক মাসে কাজের দিন যদি ২০ হয়, তা হলে এক মাসের সুতার দাম হবে ২৸৵০ আনা। এর থেকে তুলার দাম বাদ দিতে হবে।

প্রতিদিন $\frac{৩}{৪}$ গুণ্ডি সুতা কাটলে ২০ দিনে সুতা হবে ১৫ গুণ্ডি। ১৪ নম্বরের সুতা ১ গুণ্ডির ওজন $\frac{২০}{৭}$ তোলা। ১৫ গুণ্ডির ওজন হবে ৪২$\frac{৬}{৭}$ বা মোটামুটি ৪৩ তোলা। কিছু তূলা নষ্ট হবে। যদি শতকরা ১০ ভাগ তুলা নষ্ট হয় (সাধারণত এত তুলা নষ্ট হবার কথা নয় ; ছোট ছেলের হাতে প্রথম প্রথম বেশি নষ্ট হবে, এই বলে বেশি করে ধরা হয়েছে), তা হলে নষ্ট তুলার পরিমাণ হবে ৪$\frac{১৬}{২১}$ বা মোটামুটি ৫ তোলা। সুতরাং মোট তুলা লাগবে ৪৮ তোলা বা মোটামুটি ⁄॥⁄১০ ছটাক।

তুলার দর ১॥০ টাকা সের হলে (খুচরা দর ধরা হয়েছে ; গাঁটের দর ধরলে এর চেয়ে অনেক কম হবে) ⁄॥⁄১০ ছটাক তুলার দাম হয় ৸৶৫ আনা। সুতার দাম ২৸⁄০ আনা থেকে তুলার দাম বাদ গেলে বাকি থাকে ১৸৶১৫ আনা। এইটাই হবে সুতা কাটার মজুরি।

একটি শ্রেণীতে ছেলে থাকবে ৩০ জন। যদি শতকরা উপস্থিতি ৮০ হয়, তা হলে গড় উপস্থিতি হবে ২৪। ১ জন ছেলের মজুরি ১৸৶১৫ আনা হলে, ২৪ জনের মজুরি হবে ৪৬৶০ আনা।

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে আয় যেমন কম হবে, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীতে আয় তেমনই বেশি হবে। সুতরাং সুতা কাটা থেকে শ্রেণীর গড়পড়তা আয় ৪৬৶০ আনা ধরলে খুব বেশি ভুল হবে না।

একজন শিক্ষকের বেতন ৪৫৲ টাকা ধরা যেতে পারে। এ হিসাব ধরলে একমাত্র সুতা কাটা থেকেই শিক্ষকের বেতন উঠে আসবে। পরবর্তী শ্রেণীগুলিতে তাঁতের কাজ থেকে যে আয় হবে তাতে শিক্ষকের বেতন ছাড়া আরও অনেক বেশি আয় হতে পারবে, এ কথা অনায়াসেই বলা যায়।

—ছয়—

বুনিয়াদী শিক্ষায় কাজ

শিশুশিক্ষার ক্ষেত্রে কাজের ভিতর দিয়ে শিক্ষা দেবার নীতি আজ সকলেই স্বীকার করে নিয়েছেন। কিন্তু এই কাজ কি রকমের কাজ হবে তা নিয়ে মতভেদ আছে। একদল সৃজনাত্মক কাজের পক্ষপাতী, আর একদল উৎপাদনাত্মক কাজ চান।

যে কাজ মানুষ নিজেকে প্রকাশ করবার জন্য করে তাই হল সৃজনাত্মক কাজ। আর উৎপাদনাত্মক কাজ হল সেই কাজ, যা মানুষ সমাজের প্রয়োজনে করে থাকে। ছবি আঁকা বা পুতুল গড়া সৃজনাত্মক কাজ এবং চাষ করা বা কাপড় বোনা উৎপাদনাত্মক কাজ। এমন কাজও আছে যাকে পুরাপুরি সৃজনাত্মক বলা চলে, যেমন কবিতা রচনা। আবার কারখানায় পেরেক তৈয়ারি হল পুরাপুরি উৎপাদনাত্মক কাজ। তবে, সাধারণত সমস্ত কাজই এক দিক থেকে সৃজনাত্মক কাজ এবং আর দিক থেকে উৎপাদনাত্মক কাজ। কারণ, প্রায় সব কাজের ভিতর দিয়েই মানুষ যেমন নিজেকে প্রকাশ করে তেমনই সমাজের প্রয়োজনও নির্বাহ করে থাকে। তা হলেও, যে কাজের মুখ্য লক্ষ্য নিজেকে প্রকাশ করা সেই কাজকেই সৃজনাত্মক কাজ এবং যে কাজ প্রধানত সামাজিক প্রয়োজন নির্বাহের জন্য করা হয় তাকে উৎপাদনাত্মক কাজ বলা হয়। ছবি আঁকা বা পুতুল গড়াও যদি মানুষ বাজারে ছবি বা পুতুল বিক্রয়ের জন্য করে তা হলে তা হবে উৎপাদনাত্মক কাজ; এবং যখন কেউ শুধু নিজের সৃষ্টির

আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করবার জন্যই চাষ করে বা কাপড় বোনে তখন তাকেও বলা হবে সৃজনাত্মক কাজ। আসলে, কোন একটা কাজকে সৃজনাত্মক বলা হবে, না উৎপাদনাত্মক বলা হবে, তা নির্ভর করবে কাজটা কি উদ্দেশ্য নিয়ে করা হচ্ছে তার উপর।

এখন, শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে যে কাজকে গ্রহণ করা হবে সে কাজ কোন্‌জাতীয় কাজ হবে? সাধারণত সৃজনাত্মক কাজকেই এই হিসাবে গ্রহণ করা হয়। কারণ, এই কাজেই ছেলের একটা স্বাভাবিক আগ্রহ দেখা যায় এবং যে কাজ ছেলে স্বভাবতই আগ্রহের সঙ্গে করে তার ভিতর দিয়ে তার শিক্ষা ভাল হয়। কেউ কেউ ছেলেকে উৎপাদনাত্মক কাজ দেবারই পক্ষপাতী। তাঁরা চান, ছেলে যে সমাজের অঙ্গ তা সে ছেলেবেলা থেকেই বুঝতে শিখুক। সে জানুক, ছোট হলেও সমাজের প্রতি তার একটা কর্তব্য আছে এবং সমাজের কল্যাণকর কাজ করে সে সেই কর্তব্য পালন করতে শিখুক। যাঁরা ছেলের মনস্তাত্ত্বিক প্রয়োজনটাকে বড় করে দেখেন তাঁরা সৃজনাত্মক কাজ পছন্দ করেন এবং যাঁরা সমাজতাত্ত্বিক প্রয়োজনটাকে বড় করে দেখেন তাঁরা উৎপাদনাত্মক কাজ দিতে চান।

বুনিয়াদী শিক্ষায় ছেলেকে যে কাজ দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে তা শুধু সৃজনাত্মক নয়। ছেলে যে কাজ করবে সে কাজ উৎপাদনাত্মকও হওয়া চাই। এই কাজকে শুধু উৎপাদনাত্মক করলেও কিন্তু চলবে না। অর্থাৎ কারিগর যেমন কারখানায় দিনের পর দিন কোন একটা জিনিসের একটা ক্ষুদ্র অংশ তৈয়ারি করে, ছেলেকে বিদ্যালয়ে সেরকম একটা কিছু করতে দেওয়া চলবে না। ছেলেকে যে কাজ দেওয়া হবে তা একই সঙ্গে তার মনস্তাত্ত্বিক প্রয়োজন এবং

সমাজতাত্ত্বিক প্রয়োজন নির্বাহ করবে, এমনই হওয়া চাই। সেইজন্য বুনিয়াদী শিক্ষায় যে কাজ দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে তা হচ্ছে কোন একটা হস্তশিল্প। এই শিল্পের ভিতর ছেলের আত্মপ্রকাশেরও যথেষ্ট অবসর থাকবে এবং এই শিল্পের সাহায্যে যে জিনিস উৎপন্ন হবে তার একটা সামাজিক মূল্যও থাকবে। এই হিসাবে বুনিয়াদী শিক্ষাকে কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা বললে তার ঠিক পরিচয় দেওয়া হয় না, বলতে হয় শিল্পকেন্দ্রিক শিক্ষা। ইংরাজীতে বলতে গেলে, not activity-centred, but craft-centred.

শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে হস্তশিল্পকে গ্রহণ করায় একটা সুবিধা হয়েছে। ছেলেকে সৃজনাত্মক কাজ এবং উৎপাদনাত্মক কাজ দুরকম কাজই দিতে হবে। এজন্য আমরা ভিন্ন ভিন্ন কাজের ব্যবস্থা করতে পারি; একটা কাজ হবে সৃজনাত্মক এবং আর একটা হবে উৎপাদনাত্মক। কিন্তু তাতে একটা অসুবিধা আছে। কোনও কাজ যদি শুধু উৎপাদনাত্মকই হয়, তা হলে সেটা ছেলের কাছে অপ্রীতিকর হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। সেটা ছেলেকে ওষুধ খাওয়ানোর মত করে করাতে হবে এবং তাতে মনের দিক দিয়ে তার ক্ষতি হবে। এর চেয়ে অনেক ভাল হয় যদি আমরা এমন কাজের ব্যবস্থা করতে পারি যাতে ছেলের বিরক্তির সম্ভাবনা নাই, যে কাজ ছেলে স্বভাবতই আগ্রহের সঙ্গে করবে। জীবনের প্রয়োজনে মানুষকে কাজ করতেই হয়। এই যন্ত্রের যুগে কাজ অনেক সময়েই এমন হয় যে তা মানুষের পক্ষে ক্লান্তিকর হয়ে ওঠে। তখন তার প্রয়োজন হয় চিত্তবিনোদনের। তার জন্য সে সিনেমায় যায়, থিয়েটার দেখে, নেশা করে। এতে তার ক্ষতি বই লাভ হয় না। সেইজন্য যদি এমন কাজের ব্যবস্থা

করা যায় যাতে তার ক্লান্তি আসবে না, যাতে কাজের সঙ্গে সঙ্গে চিত্তবিনোদনও হয়ে যাবে, তা হলে খুব ভাল হয়। তেমনই, মনস্তাত্ত্বিক প্রয়োজনে ছেলেকে সৃজনাত্মক কাজ করতে দিতে হবে এবং সমাজতাত্ত্বিক প্রয়োজনে তাকে উৎপাদনাত্মক কাজও করাতে হবে। দু রকমের দুটি কাজ আলাদা আলাদা করে না করিয়ে যদি একই কাজের মধ্যে এই দুই রকমের গুণের সমাবেশ করতে পারা যায় তো সেই ভাল। হস্তশিল্পকে শিক্ষার মাধ্যম স্বরূপে গ্রহণ করলে তাই এই হিসাবে সুবিধা হয়।

বুনিয়াদী শিক্ষার কাজের এই ব্যবস্থা সম্বন্ধে অনেক শিক্ষাবিদের আপত্তি আছে। ছেলেকে উৎপাদনাত্মক কাজ করতে দিতে তাঁরা রাজি নন। তাঁরা হয় শুধু সৃজনাত্মক কাজই দেবেন, আর না হয় উৎপাদনাত্মক কাজ দিলেও কেবল কাজটুকুই করাবেন, কাজের ফলে উৎপাদন হল কি না হল তা দেখবেন না। শুধু সৃজনাত্মক কাজ দেবার যে অসুবিধা আছে তা আমরা আগেই দেখেছি। এতে শিক্ষার মনস্তাত্ত্বিক প্রয়োজন মেটে কিন্তু সমাজতাত্ত্বিক প্রয়োজন মেটে না। শিক্ষার সমাজতাত্ত্বিক প্রয়োজনকে যদি আমরা অস্বীকার করতে না চাই তা হলে উৎপাদনাত্মক কাজ আমাদের দিতেই হবে। আর উৎপাদনাত্মক কাজ যদি দিই তো উৎপাদনের দিকেও লক্ষ্য দিতে হবে। ছেলেকে উৎপাদনের কাজ করতে দেব অথচ তাতে উৎপাদন কিছু হল কি না হল তা দেখব না, এ হয় না। উৎপাদনের দিকে লক্ষ্য না করে উৎপাদনাত্মক কাজ করতে দিলে তাতে ছেলের ক্ষতিই করা হবে। ছেলেকে আমরা যে কাজই করতে দিই না কেন, তা ভাল করে করতে শেখাতে হবে। যেমন তেমন করে কাজ করা,

শুধু কাজের দিক থেকে নয়, চরিত্রের দিক থেকেও ক্ষতিকর। উৎপাদনাত্মক কাজ ভাল করে করা হচ্ছে কি না তার একমাত্র পরীক্ষাই হল তা থেকে উৎপাদন কেমন হচ্ছে তা দেখা। উৎপাদনের উপর জোর না দিলে উৎপাদনাত্মক কাজ কখনই ভাল হতে পারে না।

এই যে উৎপাদনের বিরুদ্ধে আপত্তি, এর কারণ কি ? বলা হয়, উৎপাদনের কাজ কখনও ছেলের পক্ষে আনন্দকর হতে পারে না। এ কাজ ক্লান্তিকর কাজ, এ কাজ ছেলেদের উপযোগী নয়। যদি ধরেই নেওয়া যায়, এ কাজ আনন্দকর নয়, তা হলেও বলা যেতে পারে, ছেলে যাতে আনন্দ পাবে কেবলমাত্র সেইরকম কাজই করবে এ তো শিক্ষার লক্ষ্য নয় ; শিক্ষার লক্ষ্য ছেলে যা করবে তাতেই আনন্দ পাবে এইরকম করে তাকে তৈযারি করা। তা ছাড়া, এ কাজ আনন্দকর নয় এমন নয়। এ কাজে ছেলে যথেষ্ট আনন্দ পায়, তা কাজের ক্ষেত্রে দেখা গেছে। শুধু তাই নয়, উৎপাদন ভাল হলে, বেশি হলে তাতেই তার আনন্দ। আমরা সকলেই জানি, ছেলে ছেলে হয়ে থাকতে চায় না, বড়দের মত হওয়া, বড়দের মত কাজ করা, এর দিকেই তার ঝোঁক। যে সমাজে বড়রা উৎপাদনের কাজ করে না সে সমাজে না হলেও, যেখানে বড়রা উৎপাদনের কাজ করে সেখানে ছেলেদের উৎপাদনের দিকে ঝোঁক প্রত্যক্ষ কাজের ক্ষেত্রে স্পষ্টই দেখা যায়। ছেলে বড়দের সমকক্ষ হতে চায়, ছোট হয়ে থাকতে চায় না, সেইজন্য বড়দের কাজ করতে তার যে আনন্দ, ছোটদের জন্য বিশেষভাবে পরিকল্পিত কাজে সে আনন্দ সে পায় না।

উৎপাদনের দিকে বিশেষ নজর দিলে ছেলের পড়াশোনার ক্ষতি হবে, এ ধারণাও কারও কারও আছে। শিক্ষা মানে পড়াশোনা

নয়, শিক্ষা হল ব্যক্তিত্বের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ। আমাদের প্রচলিত শিক্ষায় পড়াশোনার উপর খুবই জোর দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু ব্যক্তিত্বের বিকাশ সেখানে অল্পবিস্তর অবহেলিতই হচ্ছে। ছেলেকে সত্যকার শিক্ষা দিতে গিয়ে যদি তার পড়াশোনার পরিমাণ একটু কমই হয় তো তাতে এমন কি ক্ষতি হবে? তবে পড়াশোনা কম হতেই হবে, এমনও কিছু নয়। ছেলেকে কাজ তো যত তত করানো হবে না। কাজের পরিমাণ নির্দিষ্ট থাকবে এবং তার জন্য সময়ও নির্দিষ্ট থাকবে। তার বাহিরে পড়াশোনার জন্য যথেষ্ট সময় অনায়াসেই রাখা যেতে পারবে। মানুষের জীবনে পড়াশোনার প্রয়োজনীয়তাকে তো অস্বীকার করা যাবে না। পড়াশোনা চাইই এবং তার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থাও করতে হবে। তবে, বর্তমানে পড়াশোনার উপর যে অনাবশ্যক জোর দেওয়া হয়ে থাকে, প্রকৃত শিক্ষায় তার প্রয়োজন নাই, বরং তা না হলেই ভাল হয়।

আমার অনেক সময় মনে হয়, উৎপাদনাত্মক কাজের বিরুদ্ধে এই যে আপত্তি এর অনেকখানিই মানসিক। আমরা মুখে যাই বলি না কেন, মনে মনে হাতের কাজকে, এবং বিশেষ করে উৎপাদনাত্মক কাজকে, আমরা পছন্দ করি না। আমাদের অনেকের কাছেই পরিশ্রমের মর্যাদা পুঁথির পাতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। পরিশ্রমকে সত্য সত্যই সম্মানের চোখে আমরা খুব কম লোকেই দেখি। শিক্ষার ক্ষেত্রে, মানুষ হিসাবে আমাদের এই যে সংস্কার তা শিক্ষাবিদ্ হিসাবে আমাদের বিচারবুদ্ধিপ্রসূত অভিমতকে ছাড়িয়ে ওঠে। আমরা শিক্ষাবিদ্ হতে পারি, কিন্তু মানুষ তো! বহু যুগের সযত্ন-পোষিত সংস্কারকে আমরা কেমন করে কাটাব?

—সাত—

বুনিয়াদী শিক্ষা ও লেখাপড়া

বুনিয়াদী শিক্ষায় ছেলে যথেষ্ট পরিমাণ লেখাপড়া শিখতে পারে কি না, এই বিষয়ে অনেকের মনেই একটা সন্দেহ আছে। বাঙলা দেশে কয়েকটি বুনিয়াদী স্কুল আছে। এই স্কুলগুলিতে নানা অসুবিধার মধ্যে কাজ করতে হচ্ছে। সেইজন্য ছেলেদের শিক্ষা এখানে যেমন হওয়া উচিত তা হচ্ছে না। তা ছাড়া, কাজ এবং লেখাপড়ার মধ্যে যে সামঞ্জস্য থাকা প্রয়োজন তাও সব জায়গায় থাকছে না। সাধারণ স্কুলের প্রচলিত শিক্ষার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ স্বরূপেই তো বুনিয়াদী শিক্ষার প্রবর্তন। কাজেই বিদ্রোহের মনোভাবটাই কোথাও কোথাও প্রবল হয়ে গেছে। তার ফলে লেখাপড়ার চেয়ে কাজের উপরেই জোর বেশি দেওয়া হচ্ছে। এই সকল কারণে লোকের মনে এ সন্দেহটা আরও বদ্ধমূল হয়ে গেছে। লোকে ধরে নিয়েছে, বুনিয়াদী স্কুলে শুধু সুতা কাটানোই হয়, লেখাপড়া হয় না।

বুনিয়াদী স্কুলে লেখাপড়া হয় না বলে যাঁরা অভিযোগ করেন তাঁরা হয়তো এমন কথা বলবেন না যে সেখানে শিক্ষাও হয় না। লেখাপড়া এবং শিক্ষা এক জিনিস নয়। লেখাপড়া না জানলেও মানুষ শিক্ষিত হতে পারে এবং লেখাপড়া শিখেও মানুষ শিক্ষিত হয় না। এ তাঁরা স্বীকার করবেন। কিন্তু তবু লেখাপড়ার প্রয়োজন তো আছে। শিক্ষা যেমন চাই তার সঙ্গে সঙ্গে লেখাপড়াও তেমনই চাই।

শিক্ষা এবং লেখাপড়া এই তুইয়ের মধ্যে শিক্ষা মুখ্য এবং লেখাপড়া গৌণ, এ কথা স্বীকার করতেও আপত্তি নাই। শিক্ষা উদ্দেশ্য, লেখাপড়া তার একটা উপায় মাত্র। গান্ধীজীর কথায় বলতে গেলে "It is only one of the means whereby men and women can be educated." শিক্ষা হল ছেলের দেহ-মন-প্রাণের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ। মানুষের জীবনে লেখাপডার চেয়ে এরই প্রয়োজন বেশি। সেইজন্য বিদ্যালয়ের প্রথম এবং প্রধান লক্ষ্য হবে ছেলেকে শিক্ষা দেওয়া। কিন্তু ছেলের শিক্ষা তো বিদ্যালয়েই শেষ হবে না। সে যতদিন বাঁচবে ততদিন শিখবে। এই শিক্ষার উপকরণ সে নিজের অভিজ্ঞতা থেকে যেমন পাবে তেমনই পাবে তার পূর্বজদের অভিজ্ঞতা থেকে। পূর্বজদের অভিজ্ঞতার আধারই হল বই। এই বই ব্যবহার করবার মত জ্ঞান তো তার চাই। কাজেই গৌণভাবে হলেও লেখাপড়া তাকে শেখাতেই হবে।

এখন, এই লেখাপড়া শেখানো বুনিয়াদী স্কুলে হতে পারে কি না সেই হল প্রশ্ন। আজ কোন্ স্কুলে কি হচ্ছে না হচ্ছে শুধু তাই দেখে বিচার করলে চলবে না। স্কুল যথাযথভাবে গঠিত হলে সেখানে হতে পারে কি না সেইটাই ভাবতে হবে।

এখানে একটা কথা বলবার আছে। ছেলেকে লেখাপড়া শেখাতে হবে, এ সম্বন্ধে কোন মতভেদ নাই। তবে, কেমন করে শেখানো হবে সে সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদের অবকাশ আছে। যদি সাধারণ স্কুলের প্রচলিত পদ্ধতিতেই পড়াতে হবে বলে দাবি করা হয় তা হলে অন্যায় করা হবে। প্রচলিত পদ্ধতিতে যেভাবে পড়ানো হয় তাতে আপত্তি করবার যথেষ্ট কারণ আছে। অন্য কথা বাদ দিলেও তার বিরুদ্ধে

মস্ত একটা আপত্তি এই যে, সে পড়ার সঙ্গে ছেলের জীবনের কোন যোগ নাই। বুনিয়াদী স্কুলে ছেলের জীবনকে অবলম্বন করেই তাকে শিক্ষা দেওয়া হয়। কাজেই সেখানে লেখাপড়াও শেখানো হবে জীবনকে অবলম্বন করে। প্রচলিত পদ্ধতির সঙ্গে তার তফাত থাকবেই। কিন্তু তাতে ফল কিছু খারাপ হবে না, বরং তাতে ছেলে আরও সহজে আরও বেশি শিখবে।

এত কথা বলার কারণ এই যে, অনেক সময়েই ছেলেকে লেখাপড়া শেখানো হচ্ছে কি হচ্ছে না তার বিচার করা হয় কিভাবে পড়ানো হচ্ছে তাই দেখে। বর্ধমানে আমাদের একটি স্কুল ছিল। সাধারণ স্কুল, বুনিয়াদী স্কুল তখনও হয় নাই। কিন্তু সাধারণ স্কুল হলেও পড়ানো ঠিক প্রচলিত পদ্ধতিতে হত না। প্রচলিত পদ্ধতিতে ছেলেকে দীর্ঘদিন ধরে বানান মুখস্থ করানো হয়। আমরা বানানের উপর অতখানি জোর দিতাম না। আমাদের জোর ছিল তাড়াতাড়ি পড়ার উপর। তাড়াতাড়ি পড়তে হলে একটা গোটা শব্দকে একবারে দেখতে শিখতে হয়। বানান ঠিক তার উল্টা। বানান মানেই শব্দের ভিন্ন ভিন্ন অংশগুলিকে আলাদা আলাদা করে দেখানো। সেইজন্য বানানের উপর বেশি জোর দিলে তাড়াতাড়ি পড়ায় বাধা হয়। আমাদের এইভাবে পড়ানোর ফলও ভাল হচ্ছিল। ছেলে অল্পদিনেই তাড়াতাড়ি পড়তে শিখছিল। কিন্তু অনেক অভিভাবক বানানই চান। তাঁদের ধারণা, পড়তে শিখতে হলে বানান মুখস্থ করা আগে দরকার। ছেলে পড়তে শিখছে কি না পরীক্ষা করবার জন্য তাঁরা ছেলেকে বানানই জিজ্ঞাসা করেন। 'পারলৌকিক', 'কুজ্ঝটিকা', এই সব বানান। ছেলে তো এসব বানান শেখে নাই। সে বলতে পারে না।

অভিভাবক ধরে নিলেন, ছেলেকে পড়ানো হচ্ছে না। ছেলে ছাড়িয়ে নিলেন। এইরকম দৃষ্টি নিয়ে বুনিয়াদী স্কুলের পড়ানোর বিচার করলে ভুল করা হবে।

আর একটা কথা মনে রাখতে হবে। সাধারণ স্কুলের সঙ্গে বুনিয়াদী স্কুলের পার্থক্য এই যে, সাধারণ স্কুলে লেখাপড়ার জন্যই লেখাপড়া শেখানো হয়, আর বুনিয়াদী স্কুলে লেখাপড়া শেখানো হয় জীবনের প্রয়োজনে। সেইজন্য সাধারণ স্কুলে কখন কখন শুধু লেখাপড়াটুকু হয়তো বুনিয়াদী স্কুলের চেয়ে বেশি হতে পারে। কিন্তু প্রয়োজনের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হওয়ায় সে লেখাপড়াকে কাজের ক্ষেত্রে ভাল করে প্রয়োগ করা যায় না। এ লেখাপড়ার খুব বেশি মূল্য থাকে না জীবনে। লেখাপড়াকে সত্য সত্যই সার্থক করতে হলে এইরকম প্রয়োজন-নিরপেক্ষ লেখাপড়া শিখিয়ে বিশেষ লাভ নেই। একটা দৃষ্টান্ত দিই। পড়া মানে তো শুধু খানিকটা লিখিত বস্তুকে উচ্চারণ করে যাওয়া নয়। পড়ার অর্থ লিখিত বস্তুর মর্ম গ্রহণ করতে পারা এবং প্রয়োজন হলে তাকে কথায় অথবা কাজে প্রকাশ করতে পারা। এমন অনেক ছেলে দেখা গেছে যারা দেখা মাত্রই কোন একটা লেখাকে উচ্চারণ করতে পারে। কিন্তু যখনই তাকে জিজ্ঞাসা করা যায়, পড়ে সে কি বুঝল, সে কিছুই বলতে পারে না। এই পড়া তার কোন কাজেই আসে না। সাধারণ স্কুলে যদিও কখন কখন একটু বেশি লেখাপড়া শেখানো হয় তো সে এই রকমের লেখাপড়া। বুনিয়াদী স্কুলে ছেলে যেটুকু লিখতে পড়তে শেখে সেটুকুই সে কাজে লাগাতে পারে, তার সবটুকুই হয় সার্থক লেখাপড়া। দু রকমের স্কুলের মধ্যে কোন্‌টিতে ছেলে কতখানি

লেখাপড়া শিখল, এ বিচার করবার সময় এই সার্থক লেখাপড়ার কথাই ধরতে হবে। শুধু যান্ত্রিক লেখাপড়া নয়।

এই সকল দিক বিবেচনা করে দেখলে দেখা যায়, বুনিয়াদী স্কুলে লেখাপড়া কিছু কম হয় না। ছেলে স্কুলে আসার পরই তাকে নাম এবং বার তারিখ লিখতে পড়তে শেখানো হয়। প্রতিদিনই ছেলের দৈনন্দিন জীবন এবং তার প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশকে অবলম্বন করে তার সঙ্গে কথা বলা হয় এবং তার মধ্যে মনে রাখবার মত যা কিছু থাকে তাই তাদের লিখে দেওয়া হয়। তারা পড়ে এবং প্রয়োজন হলে লিখে রাখে। যখন কাজ শিখে কাজ করতে আরম্ভ করে, তখন কাজ করবার আগে কাজের পরিকল্পনা করে এবং কাজ হয়ে গেলে কাজের হিসাব করে। তাদের দিনলিপিতে এই দুইই লিখে রাখে। স্কুলে নানা উপলক্ষে নানারকম উৎসবের সময় ছেলেরা আবৃত্তি করে, গান করে, অভিনয় করে। এ ছাড়াও ছেলেদের গল্প শোনার আগ্রহ আছে। নানা রকমের গল্প তাদের বলা হয়। একটু বড় হলে গল্প পড়তেও উৎসাহিত করা হয়। স্কুলের লাইব্রেরী থেকে গল্পের বই নিয়ে তারা পড়ে। শিক্ষক প্রয়োজনমত সাহায্য করেন। উপরের শ্রেণীতে বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা প্রসঙ্গে বিভিন্ন বই থেকে যখন যা দরকার পড়িয়ে দেওয়া হয়। অনেক সময় ছেলেরা স্বতঃ-প্রবৃত্ত হয়েই বিভিন্ন বিষয় জানবার জন্য শিক্ষকের পরামর্শ অনুসারে নানারকম বই পড়ে। যা পড়ে তার প্রয়োজনীয় অংশ নিজের মত করে খাতায় লিখে রাখে। এমনি করে তাদের বিভিন্ন বিষয়ে নিজেদের বই তৈয়ারি হয়ে যায়। স্কুলের কার্য পরিচালনা ছেলেদেরই করতে হয়। তার জন্য সপ্তাহে সপ্তাহে সভা হয়। কার্যবিবরণীর

খাতায় সভার বিবরণ লিখে রাখতে হয়। মাঝে মাঝে বিতর্ক সভা হয়। বিতর্কের বিষয় সম্বন্ধে ছেলেদের পড়াশোনা করতে হয় এবং বিতর্কের বিবরণী লিখতে হয়। ছেলেদের হাতে লেখা সংবাদপত্র এবং সাময়িক পত্র আছে। গ্রাম থেকে দেশ-বিদেশের সংবাদ সংগ্রহ করে তারা সংবাদপত্র বাহির করে। নিজেদের লেখা গল্প, কবিতা প্রভৃতি নিয়ে সাময়িক পত্র হয়।

এত রকমের লেখাপড়ার কাজ বুনিয়াদী স্কুলে ছেলেকে করতে হয়। সাধারণ স্কুলের নির্ধারিত পাঠ্য পুস্তকের নির্দিষ্ট কয়েক লাইন বা কয়েক পৃষ্ঠা পড়া কি এর চেয়ে বেশি ?

—আট—

বুনিয়াদী শিক্ষা ও স্বাবলম্বন

জাকির-হোসেন-কমিটির রিপোর্টের মুখবন্ধে গান্ধীজী বলেছেন, "The scheme is a revolution in the education of village childran." এই পরিকল্পনা গ্রামের ছেলেদের শিক্ষার ক্ষেত্রে একটা বিপ্লবের সূচনা করছে। সত্যই তাই। বুনিয়াদী শিক্ষা সত্য সত্যই শিক্ষার জগতে একটা যুগান্তর নিয়ে এসেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বুনিয়াদী শিক্ষার এই বৈপ্লবিক দিকটা যেন উপেক্ষিত হচ্ছে, অন্ততঃ এই দিকটার উপর যেমন জোর দেওয়া উচিত তা দেওয়া হচ্ছে না। দেশের শিক্ষাবিদ্‌রা বুনিয়াদী শিক্ষার মূল তত্ত্বকে স্বীকার করে নিয়েছেন এবং কংগ্রেসও বুনিয়াদী শিক্ষাকে দেশের জাতীয় শিক্ষা স্বরূপে গ্রহণ করবার প্রস্তাব করেছেন। বিভিন্ন প্রদেশে কংগ্রেস গবর্মেণ্ট ধীরে ধীরে বুনিয়াদী শিক্ষা প্রবর্তন করবার চেষ্টা করছেন। কিন্তু গান্ধীজী এই শিক্ষাকে যেরূপ দিতে চেয়েছিলেন বাস্তব কাজের ক্ষেত্রে তার সে রূপ যেন থাকছে না।

গান্ধীজীর পরিকল্পিত বুনিয়াদী শিক্ষার গোড়ার কথা হচ্ছে, এই শিক্ষা স্বাবলম্বী হবে। এই বিষয়ে গান্ধীজীর উক্তিগুলি পর্যালোচনা করে দেখলে তাই দেখা যায়। 'হরিজন'-এর যে প্রবন্ধে গান্ধীজী প্রথম এই শিক্ষার কথা বলেন ৩১-৭-১৯৩৭ তারিখের সেই প্রবন্ধে তিনি শিক্ষার সংশ্লিষ্ট আর্থিক সমস্যার আলোচনা করে

বলেছেন, "I have therefore made bold, even at the risk of losing a reputation for constructive ability, to suggest that education should be self-supporting." কাজের লোক বলে আমার যে খ্যাতি আছে, এই প্রস্তাবের ফলে তা নষ্ট হয়ে যেতে পারে, তা সত্বেও আমি বলছি শিক্ষা স্বাবলম্বী হওয়া উচিত। ১৯৪৫ সালে জাতীয় শিক্ষা-সম্মেলনের উদ্বোধন করতে গিয়ে তিনি বলেন : "Whatever the criticisms may be, I know that the only education is that which is self-supporting." লোকে যে যাই বলুক, আমি মনে করি, স্বাবলম্বী শিক্ষাই একমাত্র শিক্ষা।

গান্ধীজী স্বাবলম্বনের উপরে যতখানি জোর দিয়েছেন জাকির-হোসেন-কমিটি তা দেন নাই। স্বাবলম্বনের কথা বলতে গিয়ে তাঁরা বলেছেন, "Even if it is not self-supporting in any sense it should be accepted as a matter of sound educational policy and as an urgent measure of national reconstruction. It is fortunate, however, that this good education will incidentally cover the major portion of its running expenses." যদি এই শিক্ষা স্বাবলম্বী নাই হয় তবু শিক্ষা হিসাবে এ শিক্ষা ভাল এবং জাতিগঠনের জন্যে এর প্রয়োজন আছে, এই বলে একে গ্রহণ করা উচিত। তবে সুখের বিষয়, এই শিক্ষা থেকে আনুষঙ্গিকভাবে যা আয় হবে তাতে শিক্ষার চলতি খরচের বেশির ভাগটাই উঠে আসবে। তবে জাকির-হোসেন-কমিটি আশা করছেন, শিক্ষার

আয় থেকে শিক্ষার ব্যয় অনেকখানি উঠে যাবে, কিন্তু তাঁদের মতে তা না গেলেও বিশেষ ক্ষতি নাই।

কেন্দ্রীয় শিক্ষা পরামর্শ-সমিতি এতটুকুও স্বীকার করেন নি। তাঁরা বলছেন, "The Board are unable to endorse the view that education at any stage and particularly in the lowest stages can or should be expected to pay for itself through the sale of articles produced by the pupils." ছেলেদের তৈয়ারি জিনিসের আয় থেকে শিক্ষার ব্যয়-নির্বাহ হবে, এটা শিক্ষার কোন স্তরেই, বিশেষ করে নীচের স্তরে সম্ভব হবে বলে সমিতি মনে করেন না। তাঁরা মনে করেন, এরকমটা আশা করাও উচিত নয়। সমিতির মতে শিক্ষা স্বাবলম্বী হবার সম্ভাবনা তো নাইই, শিক্ষা স্বাবলম্বী হবে এমন আশা করাও অন্যায়।

এ থেকেই দেখা যাচ্ছে, বুনিয়াদী শিক্ষার ক্ষেত্রে যাঁদের মতামত প্রামাণিক বলে গণ্য হবে তাঁরা কেউই বুনিয়াদী শিক্ষায় স্বাবলম্বনকে প্রয়োজন বলে মনে করছেন না। এইখানে তাঁরা সকলেই গান্ধীজী থেকে দূরে চলে যাচ্ছেন এবং তার ফলে যে উদ্দেশ্য নিয়ে গান্ধীজী বুনিয়াদী শিক্ষার পরিকল্পনা করেছিলেন তা ব্যাহত হচ্ছে।

বুনিয়াদী শিক্ষা কাজের ভিতর দিয়ে শিক্ষা। প্রচলিত শিক্ষার তুলনায় কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা মনস্তত্ত্বের দিক দিয়ে শিশুমনের বেশি উপযোগী এবং ছেলের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের পক্ষে বেশি কার্যকর। এইজন্যই আজ সমস্ত প্রগতিশীল দেশে শিশুশিক্ষার ক্ষেত্রে কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা প্রবর্তিত হচ্ছে। তা ছাড়া, আমাদের

দেশে দারিদ্র্য ও অর্থাভাবের জন্য সার্বজনিক শিক্ষার প্রবর্তন সম্ভব হচ্ছে না। একে সম্ভব করে তুলতে হলে শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার ব্যয়নির্বাহের একটা ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এই দিক থেকে এখানে বর্তমানে শিক্ষার সময়ে ছেলেদের কাজ করতে দেওয়ার একটা খুব বড় সার্থকতা আছে। এ সবই সত্য, কিন্তু এইগুলিই এর বড় কথা নয়।

গান্ধীজী বলেছেন ঃ "बुनियादी तालिम से आम तौर पर यही मतलब लिया जाता है कि दस्तकारियों के जरिये शिक्षा दी जाय। पर यह कुछ अंशों में ही सही है। नई तालिम की जड़े ईससे भी गहरी जातीहै। उसका आधार सत्य और अहिंसा है—व्यक्तिगत जीवन और सामाजिक जीवन दोनों मे ही।" সাধারণত বুনিয়াদী শিক্ষা বললে বোঝায় হাতের কাজের ভিতর দিয়ে শিক্ষা। কিন্তু এটা আংশিকভাবেই সত্য। বুনিয়াদী শিক্ষার মুল তত্ত্ব আরও গভীর। বুনিয়াদী শিক্ষা হল সত্য এবং অহিংসার উপর প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা।

বুনিয়াদী শিক্ষার ভিতর দিয়ে গান্ধীজী একটা নূতন সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। বর্তমান সমাজে ভোগই মানুষের লক্ষ্য এবং তা নিয়ে মানুষে মানুষে অবিরাম প্রতিযোগিতা চলেছে। তারই ফলে যুদ্ধবিগ্রহ এবং তারই ফলে এই পৃথিবীব্যাপী অশান্তি। এই অবস্থার যদি প্রতিকার করতে হয়, তা হলে সমাজকে নূতন করে গড়তে হবে, একটা নূতন ভিত্তির উপর সমাজকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এই সমাজে মানুষের লক্ষ্য হবে সেবা, ভোগ নয়; এবং প্রতিযোগিতার পরিবর্তে সহযোগিতাই হবে এই সমাজের মূলনীতি। এ সম্বন্ধে সকলেই আজ একমত। কিন্তু কেমন করে এই সমাজ প্রতিষ্ঠা করা যাবে, সেই হল কথা।

গান্ধীজী বিকেন্দ্রীকরণের পথে এই নূতন সমাজ গড়তে চেয়েছিলেন। আজকার সমাজে সমস্ত শক্তি এসে রাষ্ট্রের মধ্যে কেন্দ্রীভূত হয়েছে। রাষ্ট্রই হয়েছে আর্থিক এবং রাষ্ট্রিক সমস্ত শক্তির আধার। শক্তি যখনই কোন একটা জায়গায় কেন্দ্রীভূত হয় তখনই দুটো শ্রেণীর সৃষ্টি হয়, এক যাদের হাতে শক্তি আছে এবং আর এক যাদের হাতে শক্তি নেই। শক্তির একটা গুণ হচ্ছে এই যে, বেশি পরিমাণ শক্তি বেশি দিন কারও হাতে থাকলে তার অপব্যবহার হবেই। এ ক্ষেত্রেও তাই হয়ে থাকে। 'আছে'-র দল কর্তৃত্ব হাতে পেয়ে 'নাই'-র দলকে শোষণ করতে থাকে এবং সমাজে ভেদ ও বৈষম্যের মাত্রা দিনের পর দিন বেড়েই চলে। এর প্রতিবিধান করবার একমাত্র উপায় হচ্ছে শক্তিকে কোন একটা জায়গায় কেন্দ্রীভূত হতে না দেওয়া এবং কেন্দ্রীভুত শক্তির আধার রাষ্ট্রকে নিষ্ক্রিয় করে ফেলা। এমন একটা সমাজ গঠন করতে হবে যে সমাজে, কি আর্থিক কি রাষ্ট্রিক, সমস্ত শক্তি সমাজের সকল স্তরে ছড়িয়ে থাকবে। সমস্ত দেশ কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঞ্চলে বিভক্ত হবে এবং এই অঞ্চলগুলি হবে যথাসম্ভব স্বাধীন এবং স্বাবলম্বী। Aldous Huxleyর ভাষায় এর জন্য চাই "...the division and dispersal of power, the de-institutionalising of politics and economics and the substitution, wherever possible, of regional co-operative self-help for centralised mass-production and mass-distribution, and of regional co-operative self-government for state-inter-vention and state-control."

এইরকম সমাজের শিক্ষাও হবে স্বাধীন এবং স্বাবলম্বী। ছেলেরা বড় হয়ে ভবিষ্যতে যে সমাজ গঠন করবে তাদের শিক্ষার সময় বিদ্যালয়ে ঠিক তেমনই একটা সমাজের ভিতর দিয়ে তারা মানুষ হবে। তবেই নূতন সমাজ গঠন সম্ভব হবে। সেইজন্য গান্ধীজী শিক্ষাকে স্বাবলম্বী করতে চেয়েছিলেন।

গান্ধীজীর কাছে বুনিয়াদী শিক্ষার এই সমাজতাত্ত্বিক দিকটা বড় হয়ে থাকলেও বুনিয়াদী শিক্ষার কাজ যারা করছেন তাঁদের কাছে এটা তত বড় হয়ে দেখা দেয় নি। তাঁরা বড় করে দেখেছেন এর মনস্তাত্ত্বিক দিকটা। এর ফল এই হচ্ছে যে, শিক্ষা ব্যয়বহুল হয়ে পড়েছে, শিক্ষার প্রসার যত দ্রুত এবং যত ব্যাপক হওয়া উচিত ছিল তা হচ্ছে না। শুধু তাই নয়, নূতন শিক্ষার ভিতরকার যে বৈপ্লবিক সম্ভাবনা তা একেবারেই ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে।

বুনিয়াদী শিক্ষা কারও পেটেন্ট করা জিনিস নয়। যাঁর যেমন খুশি তিনি একে তেমনই রূপ দিতে পারেন। তা ছাড়া গতিশীল সমাজের শিক্ষাও গতিশীল হবে। এই গতিশীল শিক্ষা দেশে দেশে কালে কালে নূতন নূতন রূপ গ্রহণ করবে, এইটাই স্বাভাবিক। সে দিক থেকে বলবার বেশি কিছু নেই। কিন্তু মূলতত্ত্বের বিষয়ে কোন গোলমাল থাকলে চলবে না। তা যদি থাকে তা হলে আমাদের অসঙ্কোচে এই কথাই বলা উচিত, আমরা যে শিক্ষা প্রবর্তন করবার চেষ্টা করছি তা বুনিয়াদী শিক্ষা—অন্তত গান্ধীজী বুনিয়াদী শিক্ষা বলতে যা বুঝতেন তা—নয়।

গান্ধীজীর পরিকল্পিত বুনিয়াদী শিক্ষা যদি আমরা চাই, তা হলে

শিক্ষাকে আমাদের স্বাবলম্বী করতেই হবে। আর তা হলে দুটো জিনিসের উপর আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে। আমরা যে কাজের ভিতর দিয়ে শিক্ষা দেব সে কাজ যে-কোন কাজ হলে চলবে না। ছেলের আত্মপ্রকাশ এবং আত্মবিকাশের দিক থেকে সৃজনাত্মক কাজের যথেষ্ট্র মূল্য আছে। কিন্তু কাজ উৎপাদনাত্মক না হলে তা থেকে আয় হবে না এবং তার ফলে শিক্ষা স্বাবলম্বী হতে পারবে না। কাজেই আমাদের নির্বাচিত কাজ একটা উৎপাদনাত্মক শিল্প হওয়া চাই এবং সে শিল্প শুধু শিক্ষার উপায় হবে না, সে হবে উদ্দেশ্য ও উপায় দুইই।

এর থেকে আর একটা কথাও সঙ্গে সঙ্গেই এসে পড়ে। অনেকেই ছেলেকে একাধিক কাজ দেবার পক্ষপাতী। তাঁরা বলেন, কাজের বৈচিত্র্য না থাকলে বিদ্যালয়ের জীবন ছেলের কাছে একঘেয়ে হয়ে পড়বে এবং এরকম কাজের ভিতর দিয়ে সব জিনিস সহজে শেখানোও যাবে না। কথাটা অনেকপরিমাণেই সত্য। তা হলেও, যদি আয়ের দিকে লক্ষ্য রাখতে হয় তা হলে একটা কাজকে একটু ভাল করে না শেখালে চলবে না। কাজের বৈচিত্র্য থাকুক তাতে ক্ষতি নাই; কিন্তু একটা প্রধান কাজ থাকবে, সেইটিই হবে আয়ের উপায়। শিক্ষক যদি বুদ্ধিমান হন এবং ছেলেকে শুধু যন্ত্রের মত কাজ করতে না শিখিয়ে বুদ্ধিপূর্বক কাজ করতে শেখান, কাজকে বিভিন্ন দিক থেকে দেখেন এবং দেখাতে পারেন, তা হলে কাজ খুব বেশি একঘেয়ে হবে না এবং কাজকে উপলক্ষ্য করে বিভিন্ন বিষয় শেখাবার সুযোগও পাবেন। ছেলেকে অনেকরকম কাজ দেবার কথা আলোচনা করতে গিয়ে গান্ধীজী এক জায়গায় বলেছেন,

"By changing over from one craft to another a child tends to become like a monkey jumping from branch to branch with abode nowhere." বানর যেমন এক ডাল থেকে আর এক ডালে ঘুরে বেড়ায়, কোথাও তার একটা স্থায়ী আশ্রয় নাই, ছেলেকে কাজ পরিবর্তন করে আজ একটা কাজ কাল আর একটা কাজ করতে দিলে তার অবস্থাও তেমনই হবে। শুধু আয়ের দিক থেকে নয়, ছেলের চরিত্রের দিক থেকেও একটা কাজকে প্রধানভাবে ধরে থাকার প্রয়োজন আছে।

—নয়—

বুনিয়াদী শিক্ষার কাল ও মান

বুনিয়াদী শিক্ষার কাল ও মান নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। সেইজন্য বুনিয়াদী শিক্ষা কতদিনের শিক্ষা হবে এবং তাতে ছেলেকে কতখানি শেখানো হবে, এ সম্বন্ধে আলোচনার প্রয়োজন আছে। এই সম্পর্কে গান্ধীজীর উক্তিগুলি একত্র করে দেখলে ভাল হয়।

৩১-৭-৩৭ তারিখের 'হরিজন'-এ গান্ধীজী প্রথম এই শিক্ষার সম্বন্ধে আলোচনা করেন। সেখানে তিনি বলেছেন, "I attach the greatest importance to primary education which, according to my conception, should be equal to the present matriculation less English." প্রাথমিক শিক্ষাকেই আমি সকলের চেয়ে বেশি প্রয়োজনীয় মনে করি। এই শিক্ষা, আমার মতে, ইংরেজী বাদে বর্তমান ম্যাট্রিকুলেশনের সমান হওয়া উচিত।

১১-৯-৩৭ তারিখের 'হরিজন'-এ মহাদেব দেশাই লিখেছেন, মধ্যপ্রদেশের শিক্ষামন্ত্রী শ্রীরবিশঙ্কর শুক্লের প্রশ্নের উত্তরে গান্ধীজী বলছেন, "I should combine into one what you call now the primary education and secondary or high school education. It is my conviction that our children get nothing more in the high schools than a half-baked knowledge of English besides a super-

ficial knowledge of mathematics and history and geography, some of which they had learnt in their own language in the primary classes. If you cut out English from the curriculum altogether, without cutting out the subjects you teach, you can make the child go through the whole course in seven years instead of eleven." আজকাল যাকে প্রাথমিক শিক্ষা এবং মাধ্যমিক বা হাই স্কুলের শিক্ষা বলা হয় আমি তাকে এক করতে চাই। আমরা ধারণা, হাই স্কুলে ছেলেরা একটু ইংরেজী এবং খানিকটা অঙ্ক, ইতিহাস ও ভূগোল ছাড়া আর কিছুই শেখে না। এর কিছুটা তারা প্রাথমিক স্কুলে আগেই শিখে আসে। যদি বর্তমান পাঠ্যক্রম থেকে ইংরেজীটা একেবারে বাদ দেওয়া হয় এবং পাঠ্যবিষয় যেমন আছে তেমনই থাকে তা হলে ছেলে এগার বৎসরের পরিবর্তে সাত বৎসরে সমস্ত পাঠ্য পড়ে শেষ করতে পারবে।

১৮-৯-৩৭ তারিখের 'হরিজন'-এ একটি প্রবন্ধে গান্ধীজী লিখেছেন, "In the schools, I advocate, boys have all that boys learn in high schools less English but plus drill, music, drawing and, of course, a vocation." আমি যে স্কুলের কথা বলছি সেই স্কুলে ছেলেরা হাই স্কুলে যা শেখে ইংরাজী বাদে তা সবই শিখবে। তার সঙ্গে ড্রিল, গান এবং চিত্রাঙ্কনও শিখবে। একটা বৃত্তি তো শিখবেই।

এই প্রবন্ধেই শিক্ষার সময়ের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন, "Seven years are not an integral part of my

plan. It may be that more time will be required to reach the intellectual level aimed at by me." সাত বৎসরটা আমার পরিকল্পনার একটা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ নয়। আমি যতখানি শিক্ষা চাই তা পেতে হলে হয়তো বেশি সময়েরও প্রয়োজন হতে পারে।

২-১০-৩৭ তারিখের 'হরিজন'-এ একটি প্রবন্ধে গান্ধীজী বলেছেন, "Primary education, extending over a period of 7 years or longer, and covering all the subjects upto the matriculation standard, except English, plus a vocation...., should take the place of what passes to-day under the name of primary, middle and high school education." প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষাকাল অন্যূন সাত বৎসর হবে এবং তাতে ম্যাট্রিকুলেশন পর্যন্ত সমস্ত বিষয় শিক্ষা দেওয়া হবে। ইংরেজী শেখানো হবে না এবং একটা বৃত্তি শেখানো হবে। এই শিক্ষা বর্তমানে প্রাথমিক, মধ্য এবং উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষা বলতে যা বোঝায় তার স্থান গ্রহণ করবে।

গান্ধীজীর এই উক্তিগুলি থেকে দেখা যায় যে, তিনি বলছেন, প্রাথমিক শিক্ষার মান ইংরেজী বাদে ম্যাট্রিকুলেশনের মানের অনুরূপ হবে এবং প্রাথমিক শিক্ষার কাল সাত বৎসর হবে। কিন্তু এই দুটোর মধ্যে তিনি প্রথমটার উপরেই বেশি জোর দিচ্ছেন। ছেলেকে কোন রকমে একটু লিখতে পড়তে এবং অঙ্ক কষতে শিখিয়ে ছেড়ে দিলে হবে না। তাকে আরও বেশি শেখাতে হবে। তার শিক্ষা বর্তমান ম্যাট্রিকুলেশনের মত হওয়া চাই। মাতৃভাষার সাহায্যে শেখালে

এবং ইংরেজী বাদ দিলে এই শিক্ষার জন্য সাত বৎসর লাগবে। যদি সাত বৎসরে না হয় বেশি লাগুক, তাতে ক্ষতি নাই। কিন্তু শিক্ষার মান এর চেয়ে কম হলে চলবে না।

গান্ধীজী প্রাথমিক শিক্ষা বলতে সেই শিক্ষাকে বুঝিয়েছেন যে শিক্ষা সার্বজনিক এবং আবশ্যিকভাবে সমস্ত জাতির প্রতি প্রযুক্ত হবে। এই শিক্ষাই পরবর্তী কালে বুনিয়াদী শিক্ষা নামে অভিহিত হয়েছে।

একটা কথা এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন। 'ম্যাট্রিকুলেশনের মান' এই কথাটা গান্ধীজী বার বার ব্যবহার করেছেন। কিন্তু ম্যাট্রিকুলেশনের মান কোন একটা নির্দিষ্ট পদার্থ নয়। অন্যান্য দেশের কথা বাদ দিলেও এই দেশেই বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশনের মান বিভিন্ন। এমন কি, এক বিশ্ববিদ্যালয়েও ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ম্যাট্রিকুলেশনের মানের পরিবর্তন হয়েছে, এর পরেও হবে। সেই জন্য 'ম্যাট্রিকুলেশনের মান' কথাটা খুব মোটামুটিভাবে বুঝতে হবে। ম্যাট্রিকুলেশন বলতে প্রত্যেকটি খুঁটিনাটিতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশনের কথা মনে না করাই উচিত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশনে—অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়েও অল্প-বিস্তর তাই—এমন অনেক জিনিস আছে যা না থাকলে ভাল হত এবং যা থাকা উচিত ছিল এমন অনেক জিনিসই নাই। সার্বজনিক শিক্ষার লক্ষ্য যে ম্যাট্রিকুলেশন সে এর থেকে পৃথক হবে এবং তাই হওয়াই উচিত।

হিন্দুস্তানী তালীমী সংঘ বুনিয়াদী শিক্ষার আদর্শের ধারক ও

বাহক। তাঁরা তাঁদের 'সাত বৎসরের কাজ' নামক পুস্তিকায় এ সম্বন্ধে যা বলেছেন তা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তাঁরা বলছেন :

" 'ম্যাট্রিকুলেশনের মান' বলতে কি বোঝায় তা বলা দরকার। প্রচলিত অর্থে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পাশ করতে হলে পাঁচটি বিষয়ে শতকরা নির্দিষ্ট হারে নম্বর পেতে হয়। কয়েকটি বিষয় আবশ্যিক, কয়েকটি ঐচ্ছিক। বিষয় এবং নম্বরের হার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্নরকম। ম্যাট্রিকুলেশনেই উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের শিক্ষার পরিসমাপ্তি এবং এই শিক্ষার লক্ষ্য ছেলে যাতে কয়েকটি নির্দিষ্ট বিষয়ে শতকরা নির্দিষ্ট হারে নম্বর পেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করতে পারে তার ব্যবস্থা করা। বৎসরের শেষে একটি লিখিত পরীক্ষা হয়। ছেলে পরীক্ষায় শতকরা কত নম্বর পেল তারই উপর তার কৃতকার্যতা বা অকৃতকার্যতা নির্ভর করে।

"বুনিয়াদী শিক্ষায় শিল্পই হল শিক্ষার মাধ্যম। এই শিল্পকে অবলম্বন করে ছেলেদের প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়। কোন্ বিষয় কতখানি পড়াতে হবে তা জানাবার জন্য একটা পাঠ্যক্রম আছে, কিন্তু এই পাঠ্যক্রম হুবহু অনুসরণ করবার প্রয়োজন নাই। ছেলেরা দেখে শুনে অভিজ্ঞতা লাভ করে শিখতে থাকে। মৌখিক শিক্ষাই একমাত্র শিক্ষা নয়। এক শ্রেণী হতে আর এক শ্রেণীতে প্রমোশনের জন্য কোন বাঁধা-ধরা পরীক্ষা নাই। কাজের প্রকার, ছেলেদের এবং শিক্ষকের রক্ষিত কাজের হিসাব, নিয়মিত উপস্থিতি এবং শিক্ষকের মতামত, এইসব দেখে প্রমোশন দেওয়া হয়।

"বুনিয়াদী শিক্ষার শিক্ষাকাল পূর্ব-বুনিয়াদী শ্রেণীকে ধরে আট বৎসর। এই আট বৎসরের শিক্ষার লক্ষ্য একটা নূতন সমাজের

উপযোগী করে ছেলেকে গড়ে তোলা। শিক্ষার ফলে ছেলে এইসব গুণের অধিকারী হবে :

১। তার শরীর সুগঠিত, সুস্থ, সবল এবং শ্রমসহিষ্ণু হবে।

২। সহযোগিতার উপর প্রতিষ্ঠিত নূতন সমাজ সম্বন্ধীয় ভাবধারার সঙ্গে সে পরিচিত হবে এবং পল্লীর সমাজব্যবস্থায় কুটিরশিল্পের স্থান সম্বন্ধে তার জ্ঞান থাকবে।

৩। প্রয়োজন হলে সে যে শিল্প শিখেছে তার সাহায্যে নিজের অন্নবস্ত্রের সংস্থান করবার মত উপার্জন করতে পারবে।

৪। সে তুলা থেকে কাপড় প্রস্তুত করতে পারবে।

৫। সে নিজের খাবার উপযুক্ত তরকারি তৈয়ারি করতে পারবে।

৬। সে রান্না করতে পারবে ; এবং পরিবার অথবা গোষ্ঠীর জন্য খাদ্য রক্ষা, রান্না ও পরিবেশন সংক্রান্ত সমস্ত কাজের সম্বন্ধে তার উপযুক্ত জ্ঞান ও দক্ষতা থাকবে। সে রান্নাখাওয়ার আনুমানিক ব্যয় নির্ধারণ করতে ও হিসাব রাখতে পারবে।

৭। খাদ্যতত্ত্ব এবং স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে তার প্রাথমিক জ্ঞান থাকবে।

৮। পল্লীস্বাস্থ্য ও ব্যক্তিগত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে তার সাধারণ জ্ঞান থাকবে।

৯। সে সাধারণ অসুখবিসুখের প্রাথমিক প্রতিবিধান, চিকিৎসা ও শুশ্রূষা করতে পারবে।

১০। তার সমবায়ভাণ্ডার প্রভৃতি পরিচালনার উপযোগী সমবায় সম্বন্ধীয় সাধারণ জ্ঞান এবং হিসাব রাখবার যোগ্যতা থাকবে।

১১। সে সভায় স্বচ্ছন্দ- ও সহজ-ভাবে নিজের বক্তব্য বলতে পারবে।

১২। সে ভাল করে তার মনের ভাব প্রকাশ করে লিখতে এবং রিপোর্ট প্রস্তুত করতে পারবে।

১৩। সে মাতৃভাষায় লিখিত সাহিত্যের রস গ্রহণ করতে পারবে এবং মোটামুটি হিন্দুস্থানী জানবে।

১৪। সে দুটি লিপিতেই হিন্দুস্থানী পড়তে ও লিখতে পারবে।

১৫। সে অপরের সঙ্গে সমস্বরে ভক্তি ও জাতীয়তামূলক গান গাইতে পারবে।

১৬। সে ছবির রস গ্রহণ করতে এবং ছবি আঁকতে জানবে।

১৭। সে সাইকেলে ও ঘোড়ায় চড়তে এবং গাড়ী চালাতে পারবে।

১৮। সে স্কুলে এবং গ্রামে উৎসবের ব্যবস্থা করতে পারবে।

১৯। সে সংবাদপত্র থেকে সমসাময়িক ঘটনাবলীর সংবাদ পড়বে এবং তার ফলে পৃথিবীর আর্থিক সামাজিক ও রাষ্ট্রিক সমস্যার সম্বন্ধে তার সাধারণ জ্ঞান থাকবে।

২০। শিল্পের বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ও কার্যপ্রণালীর অন্তর্নিহিত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সম্বন্ধে তার প্রাথমিক জ্ঞান থাকবে।

২১। খাদ্য ও কাপাস চাষ, রন্ধন ও তৎসংশ্লিষ্ট কাজ, শিল্প সংক্রান্ত বিভিন্ন কাজ, নিজের ও সমাজের স্বাস্থ্যরক্ষা এবং পল্লীস্বাস্থ্য, এইসকলের পিছনে যে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আছে তার সঙ্গে তার পরিচয় থাকবে।

২২। খাদ্য ও বস্ত্র উপলক্ষ করে ভারত এবং পৃথিবীর ভূতত্ত্ব সম্বন্ধে তার জ্ঞান থাকবে।

২৩। সংবাদ- ও সাময়িক-পত্রকে বিবেচনা সহকারে ব্যবহার করবার মত ক্ষমতা তার থাকবে।

২৪। ভারতের স্বাধীনতাসংগ্রামের ইতিহাস ও ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে তার জ্ঞান থাকবে।

২৫। সে ভারতের বিভিন্ন ধর্মগুলিকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখবে এবং সাম্প্রদায়িক ঐক্য আকাঙ্ক্ষা করবে।

২৬। সে জাতের বাধা ও তৎসংক্রান্ত কুসংস্কার থেকে মুক্ত হবে।

২৭। সে নিজের গ্রাম ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলকে ভালবাসবে এবং গ্রামে থাকতে ও কাজ করতে ইচ্ছা করবে। তার মন পল্লীমুখী হবে।”

—দশ—

ওয়ার্ধা-পরিকল্পনা ও সার্জেণ্ট-পরিকল্পনা

বুনিয়াদী শিক্ষার বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়ে শিক্ষাব্রতীদের মধ্যে একটা গোলমালের সৃষ্টি হয়েছে। যাঁরা বুনিয়াদী শিক্ষার পক্ষপাতী তাঁরা কোন্ পরিকল্পনাটি গ্রহণ করবেন বুঝতে পারছেন না। যাঁরা বিরোধী এইটা তাঁদের ওজর হয়েছে; তাঁরা বলছেন, বুনিয়াদী শিক্ষা তো একটা নয়, কোন্‌টা গ্রহণ করব? সেইজন্য এই সম্বন্ধে আলোচনার প্রয়োজন হয়েছে।

একটা কথা প্রথমেই বোঝা দরকার। বুনিয়াদী শিক্ষার এই সবে আরম্ভ। কাজের ক্ষেত্রে স্থান ও কাল অনুসারে এই শিক্ষা নানা রূপ গ্রহণ করবে, এইটাই স্বাভাবিক। কোন শিক্ষাই সর্বদেশে এবং সর্বকালে এক থাকে না। প্রচলিত প্রাথমিক শিক্ষাও নয়। তা হলেও বুনিয়াদী শিক্ষার মধ্যে এখনও কোন বিভ্রান্তিকর বৈচিত্র্য দেখা দেয় নাই। বর্তমানে বুনিয়াদী শিক্ষার দুটি পরিকল্পনাই আমাদের সামনে আছে—ওয়ার্ধা-পরিকল্পনা ও সার্জেন্ট-পরিকল্পনা।

বুনিয়াদী শিক্ষা সুরু হয় ওয়ার্ধা শিক্ষা-সম্মেলনের ভিতর দিয়ে। গান্ধীজীর প্রস্তাবিত শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে অলোচনার জন্য ওয়ার্ধায় বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্‌দের এক সম্মেলন হয়। সেই সম্মেলনে শিক্ষাবিদ্‌রা এই শিক্ষার মূলনীতিকে স্বীকার করে নেন এবং ডাঃ জাকির হোসেন সাহেবের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করে তারই উপর এর পরিকল্পনা

রচনা করার ভার দেন। এই পরিকল্পনাই ওয়ার্ধা-পরিকল্পনা নামে পরিচিত হয়েছে।

এই পরিকল্পনা অনুযায়ী সেবাগ্রামে একটি বুনিয়াদী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। কংগ্রেসের নেতৃত্বে বিভিন্ন প্রদেশে গবর্মেণ্টের তরফ থেকেও বুনিয়াদী শিক্ষার পরীক্ষা চলতে থাকে। অচিরেই এই শিক্ষাপদ্ধতি দেশের প্রগতিশীল শিক্ষাবিদ্‌দের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ইতিমধ্যে যুদ্ধ বেধে যায়। যুদ্ধের পর সমাজের অন্যান্য ব্যবস্থার মত তার শিক্ষাব্যবস্থারও একটা আমূল সংস্কারের প্রয়োজন, এইরকম চিন্তা চলতে থাকে। ভারত-গবর্মেণ্টের শিক্ষাবিষয়ক পরামর্শদানের জন্য দেশের প্রসিদ্ধ শিক্ষাবিদ্‌দের নিয়ে যদিও একটি সমিতি আছে। তার নাম শিক্ষাবিষয়ক কেন্দ্রীয় পরামর্শ-সমিতি। এই সমিতি যুদ্ধোত্তর শিক্ষাব্যবস্থার একটা পরিকল্পনা করেন। তাঁরা প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বুনিয়াদী শিক্ষার নীতিকে গ্রহণ করেন এবং এই বুনিয়াদী শিক্ষা কিরকম হবে তার একটা পরিকল্পনা তৈয়ারি করেন। তখন ভারত-গবর্মেণ্টেব শিক্ষাবিষক পরামর্শদাতা ছিলেন সার জন সার্জেণ্ট। তাঁর সাম অনুসারে এই পরিকল্পনাকে বলা হয় সার্জেণ্ট-পরিকল্পনা।

এই দুটি পরিকল্পনার তুলনামূলক বিচার করতে হলে বুনিয়াদী শিক্ষার মূল কথাগুলি কি তাই দেখতে হয়। ওয়ার্ধা শিক্ষা-সম্মেলনে বুনিয়াদী শিক্ষা সম্বন্ধে যে প্রস্তাব গৃহীত হয় তাতে চারটি কথা বলা হয়েছে :

(১) এই শিক্ষা সার্বজনিক অবৈতনিক ও আবশ্যিক হবে এবং এই শিক্ষার কাল সাত বৎসর হবে।

(২) মাতৃভাষার সাহায্যে এই শিক্ষা দেওয়া হবে।

(৩) এই শিক্ষা কোন উৎপাদনাত্মক হাতের কাজকে অবলম্বন করে দেওয়া হবে।

(৪) এই শিক্ষা দ্বারা ক্রমশ শিক্ষকের ব্যয়নির্বাহ করা সম্ভব হবে।

এই চারটির উপর ভিত্তি করেই জাকির-হোসেন-কমিটির পরিকল্পনা রচিত হয়। কেন্দ্রীয় পরামর্শ-সমিতিও এই চারটিকে মোটামুটি স্বীকার করে নিয়েছেন। সেই দিক থেকে দুটি পরিকল্পনার মধ্যে অনেকখানি মিল আছে, এ কথা অনায়াসেই বলা যায়।

শিক্ষা সার্বজনিক অবৈতনিক ও আবশ্যিক হবে, মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষা দেওয়া হবে, এবং উৎপাদনাত্মক কাজকে অবলম্বন করে শিক্ষা দেওয়া হবে, এ বিষয়ে দুটি পরিকল্পনাই একমত।

শিক্ষার কাল নিয়ে দুটি পরিকল্পনার মধ্যে একটু মতভেদ আছে। ওয়ার্ধা-পরিকল্পনায় শিক্ষার কাল সাত বৎসর, সার্জেণ্ট-পরিকল্পনায় আট। কিন্তু সেটা এমন কিছু বড় কথা নয়। শিক্ষার কাল সাত বৎসরের জায়গায় আট বৎসর করতে জাকির হোসেন সাহেবের কোন আপত্তি নাই।* গান্ধীজীও অন্যূন সাত বৎসরের কথা বলেছিলেন। সাত বৎসরের বেশি হলে ক্ষতি নাই, কম যেন না হয়। শিক্ষার কাল সম্বন্ধে যেটা বড় কথা সেটা হচ্ছে শিক্ষা-সমাপ্তির বয়স। এ বিষয়ে দুটি পরিকল্পনার মধ্যে কোন মতভেদ নাই; সকলেই চৌদ্দ বৎসরে শিক্ষা সমাপ্ত করার পক্ষপাতী।

* সম্প্রতি নিখিল ভারত বুনিয়াদী-শিক্ষা-সম্মেলনের পঞ্চম অধিবেশনে বুনিয়াদী শিক্ষার কাল সাত বৎসরের জায়গায় আট বৎসর করা হয়েছে।

দুটি পরিকল্পনার মধ্যে যেটা বড় পার্থক্য তা হচ্ছে শিক্ষার ব্যয়-নির্বাহ নিয়ে। জাকির-হোসেন-কমিটি শিক্ষার দ্বারা শিক্ষার ব্যয়-নির্বাহ সম্ভব বলে ধরে নিয়েছেন। তাঁরা বলেছেন : "This good educatian will also incidentally cover the major portion of its running expenses." কেন্দ্রীয় পরামর্শ-সমিতি তা করেন নাই। তাঁরা মনে করেন, কাজ চালিয়ে যাবার যে খরচ সেইটুকুই মাত্র কাজ থেকে উঠতে পারে, শিক্ষার ব্যয়নির্বাহ হওয়া এ থেকে সম্ভব নয়। তবে, এর মধ্যেও একটা কথা আছে। এই যে পার্থক্য তা সম্ভাবনা নিয়ে, ঔচিত্য নিয়ে নয়। কেন্দ্রীয় পরামর্শ-সমিতি শিক্ষার ব্যয়নির্বাহ হওয়া সম্ভব বলে মনে করেন না। সম্ভব হলে যে তাঁদের কোন আপত্তি আছে তা নয়।

গান্ধীজী নিজে অবশ্য শিক্ষার এই দিকটির উপর খুব বেশি জোর দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, বুনিয়াদী শিক্ষা স্বাবলম্বী হবে, তা না হলে বুনিয়াদী শিক্ষা বুনিয়াদী শিক্ষাই হল না। "Such education ....must be self-supporting ; in fact self-support is the acid test of its reality."

তাঁর কথা হল, বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের আয় থেকে বিদ্যালয় পরিচালনার ব্যয় নির্বাহিত না হলে আমাদের এই বিরাট দেশের অগণিত ছেলেমেয়েকে শিক্ষা দেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। সেইজন্য বুনিয়াদী বিদ্যালয়কে আমাদের স্বাবলম্বী করতেই হবে।

এই দুই পরিকল্পনার মধ্যে আর একটা পার্থক্য হল শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে। ওয়ার্ধা-পরিকল্পনা অনুসারে সমগ্র বুনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থা এক এবং অবিভাজ্য। সার্জেণ্ট-পরিকল্পনা অনুসারে তা নয়। এই

পরিকল্পনায় শিক্ষাব্যবস্থাকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে—নিম্ন বুনিয়াদী ও উচ্চ বুনিয়াদী। নিম্ন বুনিয়াদীর শিক্ষাকাল পাঁচ বৎসর এবং উচ্চ বুনিরাদীর শিক্ষাকাল তিন বৎসর। নিম্ন বুনিয়াদী শিক্ষা-সমাপ্তির পর ছেলে ইচ্ছা করলে উচ্চ বুনিয়াদী শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে অথবা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রবেশ করতে পারে। এই ব্যবস্থার একটা দূরপ্রসারী ফল আছে।

সার্বজনিক শিক্ষার মধ্যে শ্রেণীভেদ করা চলে না। যে শিক্ষা সমগ্র জাতির সমস্ত ছেলেমেয়েকে মানুষ করবার জন্য পরিকল্পিত তাতে একদলের জন্য একরকম এবং আর একদলের জন্য আর এক-রকম ব্যবস্থা থাকা উচিত নয়। সেইজন্য ওয়ার্ধা-পরিকল্পনায় এগার বছর বয়সের পর বিভিন্ন ছেলের জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা করা হয় নাই। গান্ধীজীও এই ব্যবস্থার বিরোধী ছিলেন। তিনি এক জায়গায় স্পষ্ট করেই বলেছেন, বুনিয়াদী শিক্ষা সম্পূর্ণ হবার পূর্বে একদল ছেলেকে মাধ্যমিক বিদ্যালরে যেতে দেওয়া আমার পরিকল্পিত বুনিয়াদী শিক্ষা ব্যবস্থার বিরোধী। "This diversion of pupils from the fifth class of a basic school to a high school before they had completed the seven years of basic education is inconsistent with the system of basic education I have recommended." সার্জেন্ট-পরিকল্পনায় কিন্তু এই ব্যবস্থাই করা হয়েছে এবং এইখানেই দুই পরিকল্পনার মধ্যে আর একটা পার্থক্য এসে গেছে।

দুই পরিকল্পনার মধ্যে আরও একটা বিষয়ে একটু পার্থক্য আছে। সেটা হচ্ছে ইংরেজী শিক্ষা। ওয়ার্ধা-পরিকল্পনায় সমগ্র শিক্ষার মধ্যে

কোনখানেই ইংরেজী শিক্ষার ব্যবস্থা রাখা হয় নাই। পঞ্চম শ্রেণী থেকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে হিন্দুস্থানী শেখাবার একটা ব্যবস্থা কেবল আছে। কিন্তু সার্জেন্ট-পরিকল্পনায় উচ্চ বুনিয়াদী স্তরে ইংরেজী শেখানো যেতে পারে ইচ্ছা করলে, এইরকম একটা ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। ব্যবস্থাটা ঐচ্ছিক তা সত্য ; কিন্তু যে ভাবেই হক এইরকম একটা ব্যবস্থা থাকলে এক জায়গার বুনিয়াদী শিক্ষা এবং আর এক জায়গার বুনিয়াদী শিক্ষার মধ্যে একটা পার্থক্য এসে যাবে এবং সেটা ঠিক সার্বজনিক-শিক্ষানীতি-সম্মত হবে না। তা ছাড়া, প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ছেলেকে ইংরেজীর মত একটা বিদেশী ভাষা শিখতে দেওয়া শিক্ষাতত্ত্বের দিক দিয়েও ছেলের উপযোগী নয়।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা উল্লেখযোগ্য। গান্ধীজীর লক্ষ্য ছিল এই শিক্ষার ভিতর দিয়ে একটা নূতন সমাজ প্রতিষ্ঠা করা। পাশ্চাত্ত্য শাসনের প্রভাবে ভারতীয় সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র স্বরূপ ভারতের গ্রাম-গুলি দরিদ্র হয়ে পড়েছে এবং তাদের শোষণের উপর নির্ভর করে মুষ্টিমেয় কয়েকটি সহর বড় হয়ে উঠেছে। ধনী এবং দরিদ্রের মধ্যে পার্থক্য অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে চলেছে। গান্ধীজী এই অবস্থার পরিবর্তন করতে চেয়েছিলেন এবং তাঁর পরিকল্পিত শিক্ষার এই ছিল লক্ষ্য। "My plan···is conceived as the spearhead of a silent social revolution. It will provide a healthy and moral basis of relationship between the city and the village....and lay the foundation of a juster social order in which there is no unnatural division between the 'haves' and 'have nots." জাকির-হোসেন-কমিটিরও

এইরকম একটা সামাজিক লক্ষ্য আছে। তাঁরা আশা করেন, এই শিক্ষার ভিতর দিয়ে সেবার ভাবে অনুপ্রাণিত ও সহযোগিতার উপর প্রতিষ্ঠিত একটা নূতন সমাজ গড়ে উঠবে। তাঁরা বলেছেন: "The scheme envisages the idea of a co-operative community, in which the motive of social service will dominate all the activities of children." সার্জেণ্ট-পরিকল্পনায় এরকম কোন লক্ষ্যের কথা নাই। তবে, এ থেকে তাঁরা যে এর বিরোধী এমন কথা মনে করবার কোন কারণ আছে বলে মনে হয় না।

—এগার—

বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে একদিন

পাটনা বেসিক ট্রেনিং স্কুলের প্র্যাকটিজিং স্কুল। তারই প্রথম শ্রেণী।

সাড়ে দশটার সময় স্কুল বসে। ছেলেরা মিনিট পনের আগেই এসেছে। তাদের প্রথম কাজ ঘর পরিষ্কার করা, ঘরের আসবাবপত্র ঝাড়া মোছা, নিজেদের বসবার আসন পেতে জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখা। এতক্ষণ তাই করেছে। সাড়ে দশটার ঘণ্টা পড়তে ঘরে যখন ঢুকলাম, তখন সবই বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন সাজানো-গোছানো। ছেলেরা যে যার আসনে বসে আছে। শিক্ষকও সেইমাত্র এসেছেন।

প্রশস্ত ঘর। তারই এক পাশে সারি সারি আসন পাতা। ছোট ছোট পাটির আসন, এক এক সারে চারটি চারটি করে পাতা হয়েছে। আর এক পাশে শিক্ষকের বসবার স্থান। একখানি চেয়ার, সামনে একটি নাতিবৃহৎ টেবিল। একটু দূরে ঘরের এক কোণে একটি ছোট আলমারি। তার উপরে ক্লাসের খাতাপত্র, ভিতরে কাজকর্মের সরঞ্জাম। শিক্ষকের পিছনের দেয়ালে দেয়াল-জোড়া সিমেণ্ট-করা ব্ল্যাক্‌বোর্ড। ক্লাসে ছেলেতে মেয়েতে মিলে মোট কুড়িটি। বয়স গড়পড়তায় সাত।

ছেলেরা উঠে দাঁড়াল। শিক্ষক ছেলেদের কাছে গিয়ে দাঁত নখ

চুল দেখলেন। এমনই রোজই দেখা হয়। দাঁত মেজে না থাকলে দাঁত মাজতে বলা হয়, নখ কাটা না থাকলে নখ কেটে দেওয়া হয়। আজ কয়েকটি ছেলের মাথা আঁচড়ানো ছিল না। কেউ আঁচড়ায়ই নাই। কেউ বা আঁচড়েছে, আঁচড়ানো ভাল হয়নি। শিক্ষক বলতেই একটি ছেলে গিয়ে আলমারি থেকে কয়েকখানি চিরুনি নিয়ে এল। তাই দিয়ে তারা একে একে আঁচড়াতে লাগল। শিক্ষক সাহায্য করতে লাগলেন। সঙ্গে সঙ্গে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার সম্বন্ধে কথাও হতে লাগল।

এইবার কাজ আরম্ভ হবে। তু রকমের কাজ আছে—সুতা কাটা এবং বাগান করা। আজ বাগানের কাজ নাই। সুতা কাটা হবে। পাঁজ বার করতে গিয়ে দেখা গেল, পাঁজ বেশি নাই। আজকার দিনটা চলতে পারে কিন্তু কাল আর চলবে না। সুতরাং পাঁজ করা দরকার। প্রথম শ্রেণীর ছেলেরা ধুনতে জানে না। তারা তুলা পিঁজে উপরের শ্রেণীতে পাঠিয়ে দেয়। সেখানে ধোনা এবং পাঁজ করা হয়।

এখন তুলা পেঁজা প্রয়োজন। একটি ছেলে আলমারি থেকে তুলা এবং নিক্তি বার করে নিয়ে এল। নিক্তি উপলক্ষ করে কয় রকমের দাঁড়িপাল্লা আছে এবং কোন্‌টা কি কাজে লাগে তার সম্বন্ধে কথা হতে লাগল। বোঝা গেল, এসব কথা আগেও হয়েছে। শিক্ষক তারই উপরে নির্ভর করে প্রশ্ন করতে লাগলেন, ছাত্রেরা উত্তর দিতে লাগল। নিক্তি কি কাজে লাগে জিজ্ঞাসা করাতে একটি ছেলে বলল, সেকরারা নিক্তি দিয়ে সোনা-রূপা ওজন করে। সোনা-রূপা ছাড়া নিক্তি দিয়ে আর কি ওজন হয়? একটি ছোট মেয়ে বলল, সিঁতুরওয়ালারা সিঁতুর ওজন করে নিক্তি দিয়ে।

এক তোলা করে তুলা ওজন করতে হবে। কিন্তু তোলার বাটখারা নাই। তিন তোলা, দু তোলা এবং আধ তোলার বাটখারা আছে। কেমন করে এক তোলা ওজন করা যায়, শিক্ষক প্রশ্ন করলেন। একজন বলল, আধ তোলা দুবার করে ওজন করে। আর একজন বলল, তিন তোলা থেকে দু তোলা বাদ দিয়ে। আবার একজন বলল, দু তোলাকে অর্ধেক করে। শেষ পর্যন্ত দু তোলাকে অর্ধেক করে এক তোলা করাই স্থির হল। শিক্ষক তুলা ওজন করতে বসলেন।

ঘরে ইলেকট্রিক পাখা চলছিল। তুলা উড়ে যাচ্ছে। একটি ছেলে পাখা বন্ধ করার কথা বলল। পাখা বন্ধ করার আর কোন প্রয়োজন আছে কি না, শিক্ষক প্রশ্ন করলেন। গল্প বললেন, তিনি একদিন সেকরার দোকানে গিয়েছিলেন। সেকরা সোনা ওজন করবার সময় পাখা বন্ধ করে দিল। সোনা তো উড়ে যাবে না। তবে পাখা বন্ধ করার কি দরকার? কেউ আর বলতে পারে না। শেষে একটি ছেলে বলল, বাতাসে নিক্তি নড়বে, ওজন ঠিক হবে না। পাখা বন্ধ করা হল।

শিক্ষক দু তোলা তুলা ওজন করে তাকে দু দিকে দিয়ে অর্ধেক করলেন এবং সেইটিই যে এক তোলার বাটখারা হল তা সকলকে বুঝিয়ে দিলেন। সেই তুলা দিয়ে তিনি আর একবার তুলা ওজন করলেন। তার পর নিক্তি ছেড়ে দিলেন। ছেলেরা প্রত্যেকে এসে নিজের নিজের তুলা ওজন করতে লাগল। ওজন করা হয়ে গেলে একটি ছেলে আলমারি থেকে কয়েকখানি পিচ্‌বোর্ডের টুকরা বার করে এনে সকলকে এক একখানি করে দিল। তার উপর রেখে

তুলা পেঁজা আরম্ভ হল। ছেলেরা তুলা পিঁজতে লাগল। শিক্ষক ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলেন, কে কেমন পিঁজছে।

তুলা পেঁজা শেষ হলে পেঁজা তুলা তৃতীয় শ্রেণীতে পাঠিয়ে দেওয়া হল। তার পর তুলার হিসাব। প্রথমে গোনা হল, কয়জন ছেলে-মেয়ে আছে। তার পর হিসাব হতে লাগল। এক একজন এক তোলা করে নিলে এক সারে কয় তোলা হয়? দু সারে কত? তিন সারে, চার সারে, পাঁচ সারে? এক এক সারে চারটি করে ছেলে ছিল। সুতরাং চারের ঘর নামতা এই উপলক্ষে তৈয়ারি হল এবং কয়েকবার আবৃত্তি করা হল। তার পরে শিক্ষক প্রশ্ন করলেন, কুড়ি তোলায় কয় ছটাক হয়? ছেলেরা বলতে পারল না। কয় তোলায় ছটাক হয়? শিক্ষক আগে একদিন বলে দিয়েছিলেন। ছেলেরা ভুলে গেছে। শিক্ষক আবার বলে দিলেন। পাঁচ তোলায় এক ছটাক হলে দশ তোলায় কয় ছটাক হয়? পনেরো তোলায়, কুড়ি তোলায়? ছেলেরা উত্তর করল। শেষ হয়ে গেলে শিক্ষক সবটা আবার আবৃত্তি করলেন। ছেলেরাও করল।

তার পর পড়া এবং লেখা। শিক্ষক খড়ি দিয়ে ব্ল্যাক্‌বোর্ডের উপরে স্পষ্ট করে বড় বড় অক্ষরে লিখলেন। কয়েকটি ছোট ছোট কথা। "আমরা তুলা পিঁজেছি। একজন এক তোলা করে পিঁজেছে। আমরা কুড়ি জন। কুড়িজনে কুড়ি তোলা পিঁজেছি। পাঁচ তোলায় এক ছটাক। চার ছটাক তুলা পেঁজা হয়েছে।" হিন্দু এবং মুসলমান দুরকম ছেলেই আছে। হিন্দুরা হিন্দী পড়ে, মুসলমানের উর্দু। শিক্ষক হিন্দী এবং উর্দু দুই ভাষাতেই লিখে দিলেন। লিখে লেখাটা নিজে পড়ে দিলেন। ছেলেদের পড়তে

বললেন। সকলেই এক এক করে পড়ল। তার পর ছেলেদের সেইটা লিখতে বলা হল। তারা বেশির ভাগ শ্লেটে, কেউ কেউ খাতায়, লিখল। শিক্ষক লেখা দেখলেন এবং যেখানে ভুল হয়েছে সংশোধন করে দিলেন।

এই সময়ে জলখাবারের ঘণ্টা পড়ল। এক ঘণ্টা ছুটি। তার মধ্যে আধ ঘণ্টা সমবেত সুতা কাটা। শিক্ষক ও ছাত্র সকলে মিলে সমবেতভাবে সুতা কাটে।

জলখাবারের পর সুতা কাটা। প্রথম শ্রেণীতে ছেলেরা টাকুতে সুতা কাটে। টাকু নাটাই সব স্কুলেরই। সুতাশুদ্ধ নাটাইগুলি আগে থেকেই সুন্দর করে সার দিয়ে দেয়ালের গায়ে সাজানো ছিল। একজন ছেলে আলমারি থেকে টাকু নিয়ে সব ছেলেদের একটি একটি করে দিল। শিক্ষক এক একটি করে পাঁজ দিলেন। ছেলেরা সেই পিচ্‌বোর্ডের উপর রেখে টাকুতে সুতা কাটতে আরম্ভ করল। শিক্ষক প্রত্যেক ছেলের কাছে গিয়ে তার সুতা দেখলেন এবং যেখানে যেমন দরকার একটু একটু সাহায্য করলেন। এইভাবে ৪৫ মিনিট সুতা কাটা হল। সুতা কাটা শেষ হলে পরে ছেলেরা নাটাইয়ে সুতা জড়াল এবং কার কত সুতা হয়েছে শিক্ষককে বলল। শিক্ষক তাঁর রেজেষ্টারি-বইয়ে লিখে নিলেন। সুতা কাটা জড়ানো সব নিয়ে এক ঘণ্টা লাগল।

সুতা কাটার সময় শিক্ষক ছেলেদের সুতা কাটা দেখে এসে তার পর ছেলেদের একটা গল্প বললেন। ধুনুরী আর নেকড়ে বাঘের গল্প। ছেলেরা সুতা কাটতে কাটতে শুনতে লাগল। "গাঁয়ে ধুনুরী এসেছে। দিনরাত তুলা ধুনছে। ধুনকির শব্দ উঠছে ধপ্‌ ধপ্‌

ধাঁই ধাঁই। নেকড়ে বাঘ রোজ গাঁয়ে আসে, গাঁ থেকে ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে ধরে নিয়ে যায়। সেদিন এসে ধুনুরীর ধুনকি দেখে এবং তার ধপ্ ধপ্ ধাঁই ধাঁই শব্দ শুনে ভয় পেয়ে ফিরে গেল। লোকে দেখল, ধুনুরীর জন্যই তাদের ছেলে-মেয়ে বাঁচল। তারা ধুনুরীকে আদর করে অনেক টাকা পুরস্কার দিল। ধুনুরীর এখন টাকা হয়েছে। তবু তুলা ধোনে। লোকে বলল, আবার কেন তুলা ধোন? ধুনুরী বলল, তুলা ধুনেই তো টাকা পেলাম। তুলা ধোনা কি ছাড়া চলে? তুলা না ধুনলে তোমাদের লেপ-তোষকই বা কেমন করে হবে?" ছেলেদের সুতা কাটা শেষ হতে হতে গল্প বলাও শেষ হল। শিক্ষক ছেলেদের গল্পের সম্বন্ধে প্রশ্ন করলেন এবং শেষে জিজ্ঞাসা করলেন, কে গল্পটা আবার বলতে পারে? কয়েকটি ছেলেই হাত তুলল। শিক্ষক একজনকে গল্পটা বলতে বললেন।

সুতা কাটা শেষ হয়ে গেলে পর শিক্ষক বললেন, এইবার খেলা হবে। তিনি তাঁর রেজিষ্টারি-বই থেকে একটি করে অঙ্ক ব্ল্যাক্-বোর্ডের উপর লিখতে লাগলেন, এটা কার অঙ্ক? যার সুতার অঙ্ক সে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আমার। এমনই করে সকলের অঙ্ক তাদের দেখানো হল।

তার পর গান। বর্ষার সময়। মেঘ করে আছে। একটু আগেই এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। শিক্ষক বললেন, তিনি একটা গান শোনাবেন—বর্ষার গান। বর্ষার সময় কি হয় জিজ্ঞাসা করলেন। ছেলেরা বলল, মেঘ ওঠে, জল হয়। শিক্ষক তাঁর স্বরচিত একটি ছোট কবিতা সুর করে বললেন। ছেলেরাও

একবার শুনে নিয়ে আবার তাঁর সঙ্গে সঙ্গে বলল। শিক্ষক কবিতাটি নাগরী এবং উর্দু অক্ষরে ব্ল্যাক্‌বোর্ডের উপর লিখে দিলেন এবং ছেলেদের পড়তে বললেন। ছেলেরা একে একে পড়ল। "বাদল বরসো পানি দে দো ; কাঁহা জাতে হো, সুন লো সুন লো। উজলা বাদল কালা বন জা ; পানি-দেনেওয়ালা বন জা। গরজ গরজকর শোর মচা জা, পানি দেকর দিল বহলা জা।" কয়েকজন স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কবিতাটি নিজেদের খাতায় লিখে নিল।

ছুটির ঘণ্টা। আজকার মত ক্লাসের কাজ শেষ হল। শিক্ষক ছেলেদের ছেড়ে দিলেন। নিজেদের জিনিসপত্র গুছিয়ে তুলে রেখে ছেলেরা বেরিয়ে পড়ল।

—বার—

বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে কাজের আয়

বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে ছেলেরা কাজ করবে এবং সেই কাজের আয় থেকে বিদ্যালয়ের ব্যয়নির্বাহ হবে, এই হল বুনিয়াদী শিক্ষার একটা গোড়ার কথা। যদিও বিদ্যালয়ের ব্যয় বলতে বিদ্যালয়ের গৃহনির্মাণ প্রভৃতি সমস্ত খরচই বোঝায়, এবং যদিও বিদ্যালয়ের কাজ থেকে এই সব খরচই উঠে আসবে এইটিই গান্ধীজীর লক্ষ্য ছিল, তবু সাধারণতঃ ঠিক অতখানি আশা করা হয় না। বিদ্যালয়ের ব্যয় বলতে বিদ্যালয়ের চলতি খরচ, এবং বিশেষ করে শিক্ষকের বেতনই বোঝানো হয়। এখন বিদ্যালয়ের এই ব্যয়টা বিদ্যালয়ের কাজ থেকে কতখানি উঠতে পারে, সেইটাই হল প্রশ্ন।

হোটর-মর্যাদা বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের গত বৎসরের কাজের ফলে আমাদের যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তা নীচে দিলাম। এখানে প্রধান কাজ হল সুতা কাটা ও কাপড় বোনা। ছেলেরা এখনও ছোট, এখনও তারা কাপড় বোনার উপযুক্ত হয় নাই। সেইজন্য বলতে গেলে একমাত্র সুতা কাটার কাজই এখন আছে। সঙ্গে বাগানের কাজও আছে, কিন্তু সে নামে মাত্র। আমরা ছেলেদের উপযুক্ত-পরিমাণ জমি দিতে পারি নাই এবং বাগানের কাজের উপযুক্ত ব্যবস্থাও করে উঠতে পারি নাই। তাই বাগানের কাজ থেকে

যতখানি আয় হতে পারত তা হয় নাই। সুতা কাটার কাজও যতটা হয়েছে তার চেয়ে বেশি হতে পারত।

আমাদের বৎসর আরম্ভ হয় জুলাই মাসে। ১৯৪৭ সালের জুলাই থেকে ১৯৪৮ সালের জুন পর্যন্ত এক বছরের হিসাব দেওয়া হল। এই বছরে বিদ্যালয়ে তিনটি শ্রেণী ছিল। সুতা কাটা থেকে মাসে ছাত্র প্রতি গড় আয় হয়েছে প্রথম শ্রেণীতে /১৫, দ্বিতীয় শ্রেণীতে ৮০ এবং তৃতীয় শ্রেণীতে ১৷০। বর্তমান বৎসরে আরও একটু বেশি আয় হবে বলে আমরা আশা করছি।

সুতা কাটা ছাড়াও ছেলেরা বাগানের কাজ করেছে। নানা কারণে বর্ষার ফসল তৈয়ারি করা এ বৎসর সম্ভব হয় নাই। ছেলেরা শুধু শীতের ফসলই করেছে। এর থেকে মোট আয় হয়েছে, প্রথম শ্রেণীতে ২৲, দ্বিতীয় শ্রেণীতে ৯।০ এবং তৃতীয় শ্রেণীতে ৬/০। ছাত্র প্রতি মাসিক গড় আয় হয়, প্রথম শ্রেণীতে প্রায় ৲১০, দ্বিতীয় শ্রেণীতে প্রায় /১০ এবং তৃতীয় শ্রেণীতে প্রায় /১৫।

যদি মাসে ছাত্র প্রতি গড় আয় ১৮৴০ হয়, তা হলে শ্রেণীতে পূর্ণসংখ্যক ছাত্র থাকলে শিক্ষকের বেতন কাজ থেকে উঠে আসবে; এবং সুতা কাটা থেকেই এটা হতে পারে বলে আমাদের বিশ্বাস। প্রথম এবং দ্বিতীয় শ্রেণীতে অবশ্য যথেষ্ট আয় হবে না এবং সেই হিসাবে খানিকটা ঘাটতি পড়বে। কিন্তু ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণীতে—এবং যেখানে আট ক্লাসের স্কুল হবে সেখানে অষ্টম শ্রেণীতেও—তাঁতের কাজ হবে, এবং সে কাজ থেকে যে অতিরিক্ত আয় হবে তা থেকে এই ঘাটতি পূরণ হয়ে যাবে।

শিক্ষকের গড়পড়তা মাসিক বেতন আমরা ধরছি ৪৫৲। একজন শিক্ষকের শিক্ষাধীনে ছাত্র থাকবে ৩০ জন। যদি শতকরা উপস্থিতির হার ৮০ হয়—এবং তাই হওয়া উচিত—তা হলে শ্রেণীর গড় উপস্থিতি হবে ২৪। ২৪ জন ছাত্রকে মাসে ৪৫৲ আয় করতে হলে, ১ জন ছাত্রকে আয় করতে হবে ১৮৶০। মাসে গড় কাজের দিন হবে ২০। আলোচ্য বৎসরে আমাদের বিদ্যালয়ে গড় কাজের দিন ছিল ২১·৯। যদি ২০ দিনে ১৸৶০ আয় করতে হয়, তা হলে ১ দিনে আয় করতে হবে ⁄১০। নিখিল ভারত চরকা-সংঘের হার অনুযায়ী ১৬নং সুতা ১ গুণ্ডি অর্থাৎ ৮৫৪ গজের মজুরি হচ্ছে ৵৫।* একটু চেষ্টা করলে তৃতীয় শ্রেণীর ছেলেরা রোজিয়াম তুলাতে ১৬নং সুতা কাটতে পারবে। জরিলা তুলাতে আরও সরু সুতাই হবে। আমাদের বিদ্যালয়ে আলোচ্য বৎসরে তৃতীয় শ্রেণীর ছেলেদের সুতার গড় নম্বর ছিল ১৪ ; বর্তমান বৎসরে কেউ কেউ ১৬নং কাটতে পারছে। এই ১৬নং সুতা কেটে দিনে ⁄১০ আয় করতে হলে প্রতিদিন সুতা কাটতে হবে ৫৬৮ গজ। তৃতীয় শ্রেণীর ছেলেরা অনায়াসেই ঘণ্টায় ৩০০ গজ হিসাবে সুতা কাটতে পারবে। এই হারে সুতা কাটলে ৫৬৮ গজ সুতা কাটতে লাগবে প্রায় ২ ঘণ্টা এবং এই সুতা কাটার মত তুলা ধুনে পাঁজ করতে লাগবে প্রায় ॥ ঘণ্টা। সুতরাং মোট ২॥ ঘণ্টা সুতা কাটার কাজ করতে হবে। এই পরিমাণ সময় এর জন্য সহজেই দেওয়া যেতে পারে।

---

* ইংরেজী হিসাব অনুসারে (আমাদের দেশের কাপড়ের কলেও এইভাবেই হিসাব করা হয়) ১ গুণ্ডির পরিমাণ ৮৪০ গজ। নিখিল ভারত চরকা-সংঘের হিসাব অনুসারে ১ গুণ্ডির পরিমাণ ৮৫৩⅓ বা মোটামুটি ৮৫৪ গজ।

হোটর-মর্যাদা জাতীয় বিদ্যালয়ের সুতা কাটার আয়

১৯৪৭-৪৮

প্রথম শ্রেণী

নাম	ছাত্রসংখ্যা	গড় উপস্থিতি	সুতার পরিমাণ (গুণ্ডি)	মোট মজুরি	ছাত্র প্রতি গড় মজুরি
জুলাই	১২	১০	—	—	—
আগষ্ট	১৪	৮	৭	৸৶০	/১৫
সেপ্টেম্বর	১২	৮	৮	১৲	৶০
অক্টোবর	১১	৮	৪	॥০	/০
নভেম্বর	১১	৫	২	।০	৴১৫
ডিসেম্বর	১০	৫.২	৩	।৶০	/০
জানুয়ারি	১০	৬.২	৪	॥০	/ ৫
ফেব্রুয়ারি	১০	৬.৩	৬	৸০	/১৫
মার্চ	১০	৫.২	৪	॥০	/১০
এপ্রিল	১০	৫.২	৮॥	১/০	৶ ৫
মে	১০	৩.৮	৯	১৶০	। ১০
জুন	৯	৪.৩	৮	১৲	৶১০
বৎসরের গড়	১০.৭	৬.২	৫।	॥৶১০	/১৫

দ্বিতীয় শ্রেণী

মাস	ছাত্রসংখ্যা	গড় উপস্থিতি	সুতার পরিমাণ (গুণ্ডি)	মোট মজুরি	ছাত্র প্রতি মজুরি
জুলাই	১০	৮	৪২	৫।০	॥৵১০
আগষ্ট	১৩	১০	৪০	৫৲	॥০
সেপ্টেম্বর	১৪	৯.৩	৭০	৮৸০	৸৶০
অক্টোবর	১৪	১০.২	৫৮	৭।০	॥৶ ৫
নভেম্বর	১৪	১০	২৪	৩৲	। ১৫
ডিসেম্বর	১৪	৯	৬৩	৭৸৵০	৸৵০
জানুয়ারি	১৪	৯.৪	৩১	৩৸৵০	।৵১০
ফেব্রুয়ারি	১৪	৮.৮	৬৫	৮ ৵০	৸৵১৫
মার্চ	১৩	৭.৩	৬৯	৮॥৵০	১ ৵১৫
এপ্রিল	১২	৪.৭	৩২॥	৪ /০	৸/১৫
মে	১২	৭.৮	৬৫	৮ ৵০	১৲ ১০
জুন	১২	৮.৭	৫০॥	৬।/০	॥৶১০
বৎসরের গড় ১২.৯		৮.৫	৫০৸০	৬।/১০	৸০

তৃতীয় শ্রেণী

মাস	ছাত্রসংখ্যা	গড় উপস্থিতি	সুতার পরিমাণ (গুণ্ডি)	মোট মজুরি	ছাত্র প্রতি গড় মজুরি
জুলাই	৭	৫·৩	৭০	৮৸০	১৷৷৵ ৫
আগষ্ট	৮	৬	৫৬	৭৲	১ ৵১০
সেপ্টেম্বর	৭	৫·৩	৯২	১১৷৷০	২ ৵১০
অক্টোবর	৭	৫·৩	৭৬	৯৷৷০	১৸ ১০
নভেম্বর	৭	৫	৩৪	৪৷০	৸৴১০
ডিসেম্বর	৭	৫·১	৭৮	৯৸০	১৸৵১০
জানুয়ারি	৮	৫·৭	৬৫	৮ ৵০	১৷৵১৫
ফেব্রুয়ারি	৮	৫	৬১৷৷	৭৷৷৶০	১৷৷ ১০
মার্চ	৭	৪·৩	৬১	৭৷৷৵০	১৸ ৫
এপ্রিল	৭	৪·১	৪৬	৫৸০	১৷৵ ৫
মে	৭	৫·১	৫৬৷৷	৭৴০	১৷৵০
জুন	৭	৪·৯	৪৬৷৷	৫৸৴০	১ ৶০
বৎসরের গড়	৭·২	৫	৬১৸	৭৷৷৶১০	১৷৷০

মন্তব্য : (১) এই বৎসরে মোট ২৬৪ দিন কাজ হয়েছে। মাসে গড় কাজের দিন হয় ২১·৯।

(২) জুলাই মাসে প্রথম শ্রেণীতে ছেলেরা প্রথম সুতা কাটা শিখেছে। এই সুতা ঠিক কাজের উপযুক্ত হয় নাই বলে হিসাবে ধরা হয় নাই।

(৩) সুতার নম্বর গড়ে প্রথম শ্রেণীতে ১০, দ্বিতীয় শ্রেণীতে ১২ এবং তৃতীয় শ্রেণীতে ১৪ হয়েছে। ১৪নং পর্যন্ত সুতার মজুরি চরকাসংঘের হার অনুসারে গুণ্ডি প্রতি ৵০। মজুরি এই হিসাবেই ধরা হয়েছে।

—তের—

গ্রামসংগঠনে বুনিয়াদী শিক্ষা

ছেলেকে শুধু লিখতে পড়তে শেখানোই শিক্ষার লক্ষ্য নয়। শিক্ষার লক্ষ্য ছেলের জীবনকে গড়ে তোলা। যে শিক্ষায় ছেলের জীবনে কোন পরিবর্তন না আসে সে শিক্ষা ব্যর্থ হয়েছে বলতে হবে। সত্যকার শিক্ষা ছেলের জীবনকে পরির্তিত করবে এবং সেই পরিবর্তন সমাজের জীবনেও ফুটে উঠবে। এইখানেই শিক্ষার সার্থকতা।

বুনিয়াদী শিক্ষার মূল্য নির্ধারণ করতে হলে এই দিক থেকে বুনিয়াদী শিক্ষা কতখানি সফল হয়েছে তা দেখতে হয়। তাই দেখবার জন্য চম্পারণ গেলাম। বিহারে বুনিয়াদী শিক্ষার কর্তৃপক্ষ পরীক্ষার সুবিধার জন্য বিদ্যালয়গুলি যেখানে সেখানে না করে একটা জায়গায় করবার চেষ্টা করেছেন। চম্পারণ জেলার বেতিয়া থানাকে তাঁরা তাঁদের পরীক্ষার ক্ষেত্ররূপে নির্বাচন করেন। এইখানে সমস্ত থানাটি জুড়ে ২৭টি বুনিয়াদী বিদ্যালয় করা হয়েছে। বেতিয়া সহরের বাহিরে একটি গ্রামে একটি মাইনর স্কুলকে বাদ দিলে এই অঞ্চলটিতে বুনিয়াদী বিদ্যালয় ছাড়া আর কোন বিদ্যালয় নাই।

বিহারের এই জায়গাটিই ছিল সমচেয়ে অনগ্রসর। মাঝে মাঝে দুই একটি প্রাইমারি স্কুল ছাড়া এখানে আর কোন স্কুল ছিল না। সেই প্রাইমারি স্কুলগুলিতেও ছাত্র খুব কমই ছিল। শিক্ষা বলতেই

বিশেষ কিছু ছিল না এই সমস্ত জায়গাটিতে। ১৯৩৯ সালে এখানে বুনিয়াদী শিক্ষার প্রবর্তন হয়। তার পর এই সাত বৎসর ধরে এখানে বুনিয়াদী শিক্ষা চলছে।* বুনিয়াদী শিক্ষার প্রভাবে এখানকার গ্রামগুলিতে যে পরিবর্তন হয়েছে তা দেখলে গ্রামের সমাজজীবনের উপর বুনিয়াদী শিক্ষার প্রভাব খানিকটা বোঝা যায়।

এই শিক্ষাক্ষেত্র দেখতে গিয়ে গ্রামগুলিকে যতটা সম্ভব দেখবার চেষ্টা করেছি। গ্রামের অধিবাসীদের সঙ্গে কথা বলেছি। শিক্ষকদের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে তাঁদের প্রশ্ন করেছি। একটি বিদ্যালয়ে গিয়ে ছাত্রদেরও এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি। তাদের সঙ্গে এই নিয়ে যে আলোচনা হয় তারই একটু বিবরণ এইখানে দিলাম। ছেলেদের এই কথা থেকেই বুনিয়াদী শিক্ষা কেমন করে আস্তে আস্তে গ্রামগুলিকে গড়ে তুলছে তা কতকটা বুঝতে পারা যাবে।

রানীপুর বিদ্যালয়। বিদ্যালয় পরিদর্শন করার পর প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত গুণরাজ রামের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। বুনিয়াদী শিক্ষার বিভিন্ন দিকের কথা। কথাপ্রসঙ্গে গ্রামের উপর বুনিয়াদী শিক্ষার প্রভাব সম্বন্ধে কথা উঠল। গুণরাজবাবু বললেন, "ছেলেদেরই জিজ্ঞাসা করুন না।" সপ্তম শ্রেণী বিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ শ্রেণী। সেইখানে বসেই কথা হচ্ছিল। ছেলেরা কাজ করছিল; আমরা এক পাশে কথা কইছিলাম।

আমি ছেলেদের প্রশ্ন করলাম। ক্লাসে জন পনের ছেলে ছিল। প্রশ্ন শুনে ছেলেরা এ ওর মুখের দিকে চাইতে লাগল। আমি তাদের ভাবতে সময় দিলাম, বললাম, "তাড়াতাড়ি নাই; ভেবে বল।"

* এই প্রবন্ধ ১৯৪৫ সালে লিখিত হয়।

একটু পরেই আস্তে আস্তে আটটি ছেলে হাত তুলল। প্রশ্ন করলে যে উত্তর দিতে পারবে তার হাত তোলাই এখানকার নিয়ম। যারা হাত তুলেছিল তাদের একজনকে আমি বলবার জন্য বললাম।

বছর ষোল বয়স। বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। সৌম্য সপ্রতিভ চেহারা। ছেলেটি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "আগে আমাদের বাপ-মায়েরা আমাদের স্কুলে আসতে দিত না। মাষ্টারমশায়দের গিয়ে অনেক করে বলে কয়ে বুঝিয়ে আমাদের নিয়ে আসতে হত। ভাত খেয়ে স্কুলে আসতে হবে। কিন্তু মায়েরা সময়মত ভাত রেঁধে দিত না। অনেক সময় না খেয়েই স্কুলে আসতে হয়েছে। আজ আর সে অবস্থা নাই। বাপ-মায়েরা এখন আর স্কুলে আসায় বাধা তো দেয়ই না, বরং উৎসাহ করে পাঠিয়ে দেয়। অনেক সময় স্কুলের কথা জিজ্ঞাসা করে এবং স্কুলে কি হচ্ছে না হচ্ছে আগ্রহ করে শোনে—"

ছেলেটি আরও কি বলতে যাচ্ছিল। আমি তাকে থামিয়ে দিয়ে পাশের ছেলেটিকে বলতে বললাম। ছোট, বছর চৌদ্দর ছেলে, একটু লাজুক গোছের। "বাড়িতে আগে বড় অশ্লীল কথা বলত; এখন আর বলে না।" কথা কটি বলেই টুক করে বসে পড়ল। আমি আর একটি ছেলেকে বলবার জন্য বললাম। পর পর এক একটি ছেলে বলে যেতে লাগল।

"আগে বাড়ির কাপড়চোপড় এবং ঘরদুয়ার খুব অপরিষ্কার হয়ে থাকত। গ্রামের রাস্তাঘাটও মোটেই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ছিল না। এখন আমরা নিজেরা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকি এবং বাড়িঘর পরিষ্কার রাখবার কাজে মায়েদের সাহায্য করি। ছেলেদের নিয়ে একটা গ্রাম-সাফাই-দল করা হয়েছে। এই দল সপ্তাহে একদিন করে গ্রামের

রাস্তাঘাট পরিষ্কার করে। বয়স্ক ছেলেরা প্রথমে দূরে দূরে থাকত। এখন তাদের মধ্যেও অনেকে এসে আমাদের কাজে যোগ দেয়।"

"খাওয়াদাওয়ার বিষয়ে আগে কোন সাবধানতা ছিল না। এখন হয়েছে। খাবার না ঢেকেই রেখে দেওয়া হত, বাসি পচা কোন কিছুর বাছবিচার ছিল না। এখন আর তা নাই।"

"আগে বাড়িতে অসুখবিসুখ করলে সময়মত চিকিৎসা বা শুশ্রূষার কোন ব্যবস্থা করা হত না। যাদের পয়সা নাই তাদের তো কথাই নাই। যাদের পয়সা আছে তারাও অসুখ করলে ডাক্তার ডাকা দরকার বলে মনে করত না। রোজারা এসে ঝাড়-ফুঁক করত। তাতে যদি রোগী ভাল হল তো হল। অনেক রোগী মারা যেত। অনেকে ভুগত। এখন আমরা সকলকে চিকিৎসার প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়ে দিয়েছি। অল্প-স্বল্প কিছু হলে, মাষ্টারমশায়দের কাছে ওষুধ থাকে, তাই নিয়ে যায়। বেশি কিছু যদি হয়, ডাক্তার ডাকে। আমরা গ্রামে সেবা-দল গঠন করেছি। লোকের অসুখ করলে আমরা গিয়ে সেবা করি।"

"দেশ-বিদেশের খবর জানবার বা বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানলাভ করবার কোন আগ্রহ আগে ছিল না। এখন মাষ্টারমশায়দের কাছে এসে অনেক বিষয়ে অনেক কথা শোনে। গ্রামে সভাসমিতি হলে শুনতে যায় এবং পরে আবার সেইসব নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে।"

"আগে বেশির ভাগ লোকই পড়তে জানত না। যারা পড়তে জানে তাদেরও পড়ার আগ্রহ ছিল না। এখন আমরা অনেককে পড়তে শিখিয়েছি। গ্রামে লাইব্রেরি হয়েছে। তা থেকে বই নিয়ে

পড়ে। আমাদের একটা রামায়ণ-মণ্ডপ আছে। সেখানে সন্ধ্যা-বেলায় আমরা রামায়ণ পড়ে শোনাই। মাঝে মাঝে আমরা গ্রামের মধ্যে সভা করি। সভায় বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়।"

"আগে আমাদের কোন কাজেই গ্রামের লোকের কোন উৎসাহ ছিল না। এখন তারা আমাদের গ্রাম-পরিষ্কারের কাজে সহায়তা করে। গ্রামের উৎসব প্রভৃতিতে সকলে মিলে মিশে ভাল করে যাতে উৎসব প্রতিপালিত হয় তার চেষ্টা করে। আমরা অভিনয় প্রভৃতি করলে আগ্রহ করে শুনতে আসে। অনেকে আমাদের অভিনয়ে যোগও দেয়।"

ছেলেদের কথা শেষ হল। তার পর খানিকক্ষণ এই নিয়ে আলোচনা চলতে লাগল। এ আর এক একটি ছেলের আলাদা আলাদা কথা নয়। শিক্ষক ছাত্র সকলে মিলে কথাবার্তা। আমিও মাঝে মাঝে তাতে যোগ দিচ্ছিলাম।

নতুন কথাও কিছু শোনা গেল। গ্রামের লোকের স্কুলের প্রতি আগে কোন অনুরাগ ছিল না। এখন স্কুলে আসে, খোঁজখবর নেয়, প্রয়োজন হলে স্কুলের কাজে সাহায্যও করে। স্কুলের জন্য মনে মনে একটা গর্ব অনুভব করতে শিখেছে।

স্কুলের তৈয়ারি জিনিস থেকেই স্কুলের আয়। জিনিস গ্রামে বিক্রি করতে পারলে সুবিধা হয়। অধিকাংশ জিনিস এখন গ্রামেই বিক্রি হয়ে যায়। গ্রামের লোক তা বুঝেছে এবং এ বিষয়ে সাহায্যও করছে।

গ্রামে সুতা কাটা ছিল না। ছেলেরা বাড়িতে সুতা কাটার

প্রবর্তন করেছে। স্কুলে যা সুতা কাটা হয় তা স্কুলের। বাড়িতে নিজেদের প্রয়োজনের জন্য ছেলেরা সুতা কাটে। দেখাদেখি বাড়ির লোকেরাও সুতা কাটা আরম্ভ করেছে। স্কুলে তাঁত হয়েছে। স্কুলে যে সুতা হয় তাতে সারা মাস তাঁত চলতে পারে না। ছেলেরা বাড়িতে গিয়ে ধরেছে, তাদের তাঁত বন্ধ গেলে চলবে না, সুতা চাই।

গ্রামের লোকের সাহস বেড়েছে। বাহির থেকে বড় বড় লোক স্কুল দেখতে আসেন। আগেকার দিনে হয়তো ভরসা করে কাছে যেতেই পারত না। এখন তাঁদের কাছে যায়, কথাবার্তা বলে, আলাপ-আলোচনাও করে।

গ্রামে ঝগড়াঝাঁটি কমে গেছে। শিক্ষকেরা গ্রাম্যসমাজের নেতার স্থান গ্রহণ করেছেন। ঝগড়াঝাঁটি বিবাদবিসংবাদ হলে লোকে তাঁদের কাছে আসে। তাঁরাই সালিশি করে মিটিয়ে দেন।

ইতিমধ্যে ছুটির ঘণ্টা বেজে গেছে। নমস্কার প্রতিনমস্কারের পর বিদায় গ্রহণ করলাম।

—চৌদ্দ—

বিদ্যালয় গঠন

গঠনকর্মীদের মধ্যে আজ সর্বত্রই বুনিয়াদী শিক্ষার সম্বন্ধে একটা আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছে। সকলেই চায় বুনিয়াদী বিদ্যালয় করতে। এর মধ্যে আশ্চর্য্য হবার কিছু নাই। গান্ধীজীর গঠনকর্মপন্থার লক্ষ্য ছিল সত্য এবং অহিংসার উপর প্রতিষ্ঠিত একটা নূতন সমাজ গঠন। এই নূতন সমাজ গঠনের ভিত্তিই হল বুনিয়াদী শিক্ষা। সেইজন্য বুনিয়াদী শিক্ষা গান্ধীজী-প্রতিষ্ঠিত গঠনকর্মগুলির মধ্যে একটা প্রধান স্থান অধিকার করে আছে। যাঁরা গান্ধীজীর প্রদর্শিত পথে নূতন সমাজ গঠন করতে চান তাঁরা বুনিয়াদী শিক্ষার সম্বন্ধে আগ্রহান্বিত হবেন, এটা খুব স্বাভাবিক।

কিন্তু বুনিয়াদী বিদ্যালয় করার পথে অনেক বাধা। শিক্ষক চাই, ছাত্র চাই এবং বিদ্যালয়ের ঘর ও সাজসরঞ্জামের জন্য অর্থ চাই। এর কোনটিই সুপ্রাপ্য নয়। শিক্ষকতা যার তার কাজ নয়। তা ছাড়া, বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার জন্য একটা বিশেষ রকমের শিক্ষার প্রয়োজন। তার পর, শিক্ষক হলেই হবে না। ছাত্র চাই। শিক্ষা বলতে এখনও আমরা প্রচলিত শিক্ষাই বুঝি। প্রচলিত শিক্ষার সঙ্গে বুনিয়াদী শিক্ষার অনেক তফাত। সেইজন্য শিক্ষানুরাগী লোকদের মধ্যেও বুনিয়াদী শিক্ষার প্রতি অনুকূল-মনোভাবাপন্ন লোক বেশি নাই। জনসাধারণের মধ্যে এই রকমের লোক আরও

কম। স্কুল করলেই যে যথেষ্ট ছাত্র পাওয়া যাবে তা নয়। শিক্ষক এবং ছাত্র ছাড়াও অর্থের প্রয়োজন। স্কুল করতে গেলেই তার জন্য ঘর চাই। কাজের স্কুল, শুধু বসে বসে পড়া নয়। সুতরাং কাজ করবার মত একটু বড় ঘরই দরকার। ভাল করে কাজ করতে গেলে একখানি ঘর হলেও চলবে না। কাজ আরম্ভ করবার সময়েই অন্ততঃ তিনখানি ঘর হলেই ভাল হয়—একটি সুতা কাটার ঘর, একটি তুলা ধোনার ঘর এবং একটি সাজসরঞ্জাম রাখার ঘর। তা ছাড়া, সুতা কাটাই স্কুলের একমাত্র কাজ হবে না। আর কোনও কাজের ব্যবস্থা করতে না পারলেও গ্রামের স্কুলে বাগান করার ব্যবস্থা রাখতেই হবে। কারণ, এ দেশ চাষীর দেশ। গ্রামের অধিকাংশ অধিবাসীই কৃষিজীবী। ছেলে তার সামাজিক পরিবেশের মধ্যে যে কাজটা সকলের চেয়ে বেশি দেখতে পাবে সে হচ্ছে চাষ। বাগান করার ব্যবস্থা করতে হলে তার উপযুক্ত জমি চাই। এই সব কিছুরই জন্য অনেক অর্থের প্রয়োজন। শিক্ষক যদিও মেলে ছাত্র মেলে না, এবং ছাত্র মিললেও অর্থ সংগ্রহ করা কঠিন হয়ে ওঠে।

এই অবস্থায় বিদ্যালয় করা যাবে কেমন করে? এ প্রশ্নের সমাধান কর্মীকে নিজেকেই করতে হবে। বাহিরের সাহায্যের প্রত্যাশায় বসে থাকলে চলবে না। বাহিরের সাহায্য না পাওয়া গেলে বড় করে কাজ করা সম্ভব হবে না। কিন্তু ছোট করে কাজ আরম্ভ করা যাবে না এমন নয়। এইভাবে কাজ আরম্ভ করায় লোকসান কিছু নাই। বিদ্যালয় বড় হয়ে গড়ে উঠতে সময় লাগবে; কিন্তু বিদ্যালয়ের মধ্যে যদি প্রাণ থাকে তা হলে ধীরে ধীরে গড়ে সে উঠবেই। আর এই গড়ে ওঠাই হবে ঠিক। বাহির থেকে

একেবারে বড় করে গড়ে তোলা জিনিস অধিকাংশ স্থলেই প্রাণহীন হয়। প্রাণবান জিনিস তার প্রাণের প্রয়োজনে ধীরে ধীরে বড় হয়ে ওঠে। একটা বড় বাড়ি সাত দিনেই তৈয়ারি করা যায়, কিন্তু একটা বড় গাছ তৈয়ারি হতে বহু বৎসর লাগে।

বিদ্যালয় হবে গ্রামের জীবনের একটা অঙ্গ। গ্রামের জীবনের প্রয়োজনে সে যদি গ্রামের ভিতর থেকে আপনা-আপনি গড়ে ওঠে তো সেই হবে স্বাভাবিক। কর্মী এই কাজে সাহায্য করবেন। গ্রামের লোকে বিদ্যালয়ের প্রয়োজন অনুভব করুক আর নাই করুক, বাহির থেকে গিয়ে গ্রামে বিদ্যালয় গড়ে তুলতে হবে, এ কাজ কর্মীর নয়। বুনিয়াদী শিক্ষাপদ্ধতির একটা গোড়ার কথা হচ্ছে, ছেলেকে যে শিক্ষা দেওয়া হবে তা হবে তার অনুভূত প্রয়োজনের তাগিদে, in response to a felt need। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের গঠনপদ্ধতির সম্বন্ধেও এই কথা প্রযোজ্য। গ্রামের লোকেরা হয়তো শিক্ষার প্রয়োজনই অনুভব করে না। এ অবস্থায় কর্মীর কাজ হবে প্রথমে গ্রামবাসীর মনে শিক্ষার প্রয়োজন-বোধ জাগিয়ে দেওয়া এবং তার পর যখন তারা এই প্রয়োজন অনুভব করবে তখন তাদেরই সাহায্যে ধীরে ধীরে বিদ্যালয় গড়ে তোলা।

ধরে নেওয়া যাক, কর্মী এই প্রথম গ্রামে যাচ্ছেন। তাঁর কর্তব্য কি হবে? আমি বলব, কর্মী প্রথম থেকেই বিদ্যালয় করবার মতলব নিয়ে যাবেন না। তাঁর প্রথম কাজ হবে গ্রামে গিয়ে গ্রামবাসীর প্রতিবেশী হিসাবে গ্রামে বাস করা। তিনি নেতাও হবেন না, সেবকও হবেন না, তিনি হবেন স্রেফ গ্রামবাসী, পাঁচজন গ্রামবাসীর মধ্যে একজন। জীবিকানির্বাহের জন্য তিনি গ্রামবাসীর

উপর নির্ভর করবেন না। তিনি স্বাধীনভাবে নিজের কাজের উপর নির্ভর করে জীবিকানির্বাহ করবার চেষ্টা করবেন। সে যোগ্যতা না থাকে তো সকলের আগে সেই যোগ্যতাই তাঁকে অর্জন করতে হবে। বাহিরের কোন প্রতিষ্ঠান থেকে মাসে মাসে টাকা আসবে এবং কর্মী তারই উপর নির্ভর করে গ্রামে বাস করতে থাকবেন, এও ভাল নয়। শুধু কাজের যোগ্যতা থাকলেই কাজ করা যায় না। তার জন্য উপকরণ দরকার, যন্ত্রপাতি দরকার। সুতরাং টাকার প্রয়োজন। এই টাকা কর্মীকে কোন প্রতিষ্ঠান বা কোন সহানুভূতি-সম্পন্ন বন্ধুর কাছ থেকে নিতে হবে। কিন্তু তিনি এই টাকা মূলধন হিসাবেই ব্যবহার করবেন। এই টাকা থেকে দৈনন্দিন প্রয়োজনের জন্য খরচ করবেন না। যদি কোন কর্মী নিজের উপার্জনের উপর নির্ভর করে জীবিকানির্বাহ করতে না পারেন তা হলে খানিকটা বাহিরের সাহায্য তাঁকে নিতেই হবে। তবে এই সাহায্যের পরিমাণ যত কম হয় ততই ভাল। প্রথম প্রথম হয়তো বাহিরের সাহায্য একটু বেশিই নিতে হবে। কিন্তু কর্মী এমনভাবে কাজ করবেন যাতে এই সাহায্যের পরিমাণ ক্রমশঃ কম হয়ে আসে এবং শেষে এর প্রয়োজন আর না থাকে।

মোটের উপর কর্মীকে স্বাবলম্বী হতে হবে। বুনিয়াদী শিক্ষার ভিতর দিয়ে আমরা একটা স্বাবলম্বী গ্রামসমাজ গঠন করতে চাই। স্বাবলম্বী গ্রামসমাজের ভিত্তি হল স্বাবলম্বী মানুষ। সেইজন্য এই শিক্ষার লক্ষ্য হবে স্বাবলম্বী মানুষ তৈয়ারি। এই শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে যে ছেলে বেরুবে, আবশ্যক হলে নিজের প্রাথমিক প্রয়োজন নির্বাহ করবার মত শক্তি তার থাকবে। এইরকম শিক্ষার

প্রবর্তন করতে হলে কর্মীকে নিজের জীবনও এইভাবে গঠন করতে হবে।

কর্মী শুধু যে স্বাধীনভাবে নিজের জীবিকানির্বাহ করবার চেষ্টা করবেন তাই নয়, গ্রামবাসীর মধ্যে তিনি যে আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে চান নিজের জীবনেও সেই আদর্শ অনুসরণ করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যেতে পারে, কর্মী নিজে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকবেন এবং নিজের ঘরদুয়ার ও চারপাশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখবেন। নিজের গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় সব কাজ যথা-সম্ভব নিজেই করবেন। নিজের কাপড়ের জন্য সুতা কাটাবেন এবং নিজের আবশ্যক তরিতরকারি নিজেই করে নেবার চেষ্টা করবেন।

গ্রামে বাস করতে হলে মানুষকে গ্রামের সামাজিক কর্তব্য পালন করতে হয়। কর্মীকেও গ্রামবাসী হিসাবে তাঁর সামাজিক কর্তব্যের সম্বন্ধে অবহিত হতে হবে। গ্রামে থাকতে থাকতে গ্রামের অভাব-অভিযোগগুলি আপনা-আপনিই তাঁর চোখে পড়বে। তার সম্বন্ধে তিনি গ্রামবাসীদের সঙ্গে আলোচনা করবেন এবং সকলের মিলিত চেষ্টায় একে একে সেগুলি দূর করবার চেষ্টা করবেন।

এইভাবে কাজ করতে গেলে গ্রামের ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার প্রশ্নও কর্মীর সামনে আপনিই এসে পড়বে। কোথাও হয়তো কোন বিদ্যালয়ই নাই। কোথাও বা প্রচলিত শিক্ষার একটা মামুলী বিদ্যালয় মাত্র আছে। যেখানে সম্ভব হবে কর্মী গ্রামবাসীদের সঙ্গে পরামর্শ করে বুনিয়াদী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করবেন। যে গ্রামে বিদ্যালয় নাই সেখানেই এটা সম্ভব হতে পারে ; তা হলেও সর্বত্রই সম্ভব হবে না। যেখানে হবে, কর্মী গ্রামবাসীদের সহযোগিতায়

শিক্ষক ছাত্র ও অর্থ সংগ্রহ করে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করবেন। দরিদ্র গ্রামে বাহিরের সাহায্য গ্রহণ করতে হতে পারে। কিন্তু সে সাহায্য গ্রামবাসীদের দেওয়া সাহায্যের চেয়ে কম হলেই ভালই হয়। বেশির ভাগটা গ্রামের লোকদের নিজেদেরই করতে দিতে হবে। নিজেদের চেষ্টায় বিদ্যালয় গঠন করতে পারলে গ্রামবাসীরা বিদ্যালয়কে নিজেদের বিদ্যালয় বলে অনুভব করতে পারবে। বিদ্যালয়ের সঙ্গে তাদের একটা প্রাণের যোগ স্থাপিত হবে। তা ছাড়া, এইভাবে বিদ্যালয় করার ভিতর দিয়ে গ্রামবাসীদের নিজেদেরও একটা শিক্ষা হবে।

গ্রামকে স্বাবলম্বী করাই আমাদের লক্ষ্য। আগে বাহিরের চেষ্টায় গ্রামের সমস্ত অভাব অভিযোগ দূর করে তার পরে ধীরে ধীরে গ্রামকে স্বাবলম্বী করা যাবে, এ হয় না। গোড়া থেকে স্বাবলম্বনের পথে চলতে চলতেই গ্রামবাসীরা স্বাবলম্বী হতে শিখবে। বাহিরের সাহায্য মানুষকে দুর্বল করে ফেলে; ভিতরের সাহায্য মানুষকে সবল করে তোলে। আমরা গ্রামে যদি বলিষ্ঠ মনুষ্যত্বের প্রতিষ্ঠা করতে চাই, তা হলে যথাসম্ভব বাহিরের সাহায্য বাদ দিয়েই আমাদের চলতে হবে। শুধু বিদ্যালয় নয়, সমস্ত গঠনকর্ম সম্বন্ধেই এই কথা।

যেখানে গ্রামের জনমতকে বুনিয়াদী শিক্ষার অনুকূলে গঠন করতে পারা যাবে না, সেখানে কর্মী কি করবেন? দেশের বর্তমান অবস্থায় অধিকাংশ স্থানে এইরকমটা হবার সম্ভাবনাই বেশি। এই-রকম স্থলে কর্মীকে নিজেকেই বুনিয়াদী শিক্ষার ভার নিতে হবে। রীতিমত বিদ্যালয় সেখানে সম্ভব হবে না; কিন্তু দুই একজন সহানুভূতিসম্পন্ন লোক গ্রামে নিশ্চয়ই থাকবেন। তাঁদের দু চারটি

ছেলে যা পাওয়া যাবে তাই নিয়েই কর্মী বিদ্যালয়ের কাজ সুরু করবেন। এইসব ক্ষেত্রে কর্মীকে শিক্ষকতার শিক্ষা গ্রহণ করে নিজেকেই শিক্ষকতা করবার জন্য তৈয়ারি হতে হবে।

এইভাবে দু চারটি ছেলে নিয়ে কাজ করলে বিদ্যালয়ের জন্য আলাদা ঘরের প্রয়োজন হবে না। ছেলেরা কর্মীর ঘরে বসে তাঁরই সঙ্গে কাজ করবে। কাজের জন্য অতিরিক্ত সাজসরঞ্জাম যা দরকার হবে তা কর্মী নিজে ছেলেদের সাহায্যে কতকটা তৈয়ারি করে নেবেন। যেটা সম্ভব হবে না সেটা কিনতে হবে। এইসব কিনবার মত টাকা ছেলেদের অভিভাবকেরাই হয়তো দিতে পারবেন। না পারলে তা বাহির থেকে সংগ্রহ করতে হবে। শিক্ষক ছাত্র ঘর ও সরঞ্জামের সমস্যার এইভাবে সমাধান হয়ে যাবে।

তারপর শিক্ষাদানের কথা। এর জন্য কোন বিশেষ ব্যবস্থার প্রয়োজন হবে না। ছেলেরা কর্মীর সঙ্গে কর্মীরই মত জীবন যাপন করবার চেষ্টা করবে। খাওয়াদাওয়া এবং বাড়ির প্রয়োজনীয় গৃহ-কর্মের জন্য যতটুকু সময় প্রয়োজন মাত্র ততটুকু সময়ই তারা বাড়িতে থাকবে। বাকি সমস্ত সময় কর্মীর কাছে থাকবে এবং কর্মীর সঙ্গে কাজ করবে। এই কাজই হবে তাদের বড় শিক্ষা। এর ভিতর দিয়েই তাদের ব্যক্তিত্বের বিকাশ হতে থাকবে এবং তারা তাদের অভ্যাস ও মনোবৃত্তি গঠন করতে শিখবে। লেখাপড়া প্রভৃতি অবশ্য আলাদা করে শেখাতে হবে এবং এর জন্য কর্মীকে খানিকটা সময় বিশেষভাবে দিতে হবে।

এখন প্রশ্ন, এইভাবে সময় দিতে হলে কর্মী নিজের জীবিকা-নির্বাহের জন্য কাজ কেমন করে করবেন? সত্যই, নিজের পরিশ্রমের

দ্বারা জীবিকানির্বাহ এবং শিক্ষকতা, একই সঙ্গে এই দুই কাজ পুরা-পুরি করা সম্ভব নয়। কর্মীকে শিক্ষকতার জন্য যে সময় দিতে হবে সেই সময়ে তিনি জীবিকানির্বাহের কাজ করতে পারবেন না। এর জন্য তাঁর যে ক্ষতি হবে সেটা অন্যভাবে পূরণ করে দিতে হবে। কতকটা হবে বিদ্যালয় থেকে। ছেলেরা কর্মীর সঙ্গে কাজ করবে এবং এই কাজ থেকে কিছু আয় হবে। বুনিয়াদী বিদ্যালয় স্বাবলম্বী হবার কথা। কিন্তু বিদ্যালয় স্বাবলম্বী হতে সময়ের দরকার। তা ছাড়া, যথেষ্টসংখ্যক ছাত্র না হলে বিদ্যালয় কোনদিনই স্বাবলম্বী হতে পারে না। তা হলেও ছেলেদের কাজ থেকে খানিকটা আয় হবেই। বাকিটুকু ছেলেদের অভিভাবকেরা পূরণ করে দেবেন। কর্মী যাদের ছেলে মানুষ করবেন তাদের তো তার প্রতিদানে তাঁকে কিছু দেওয়া উচিত। তারা তা না দেবে কেন?

এইভাবে কিছুদিন চলার পর যদি কর্মীর যোগ্যতা থাকে এবং তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করেন তা হলে ছেলেরা তাঁর শিক্ষার দ্বারা উপকৃত হবেই। তখন তাঁর এই বিদ্যালয় অন্যান্য গ্রামবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। তাঁরা কর্মীর কাছে নিজেদের ছেলেদের দিতে চাইবেন। সেই সময়ে বিদ্যালয়ের জন্য আলাদা ঘরের এবং বেশি সংখ্যক সাজসরঞ্জামের প্রয়োজন হবে। এই প্রয়োজন যাঁরা ছেলে দিচ্ছেন তাঁরাই মেটাবেন। ক্রমশঃ ছাত্র বেশি হলে আরও শিক্ষকের প্রয়োজন হবে। সে শিক্ষক কর্মী সংগ্রহ করে দেবেন এবং তার ব্যয় অভিভাবকেরা বহন করবেন। শিক্ষা ভাল হলে গ্রামবাসীরা আনন্দের সঙ্গেই এইসমস্ত ব্যয় বহন করবেন বলে আশা করা যায়।

এইরকম করে ক্রমে ক্রমে গ্রামবাসীর প্রয়োজনে গ্রামের ভিতর থেকে বিদ্যালয় গড়ে উঠবে। এইভাবে বিদ্যালয় গঠন সময়সাধ্য এবং এর জন্য বিশেষ ধৈর্যেরও প্রয়োজন। এ কাজ কঠিন কাজ। কিন্তু কোন বড় কাজই সহজ নয়। তা ছাড়া, যদি আমরা গান্ধীজীর প্রদর্শিত পন্থায় কাজ করতে চাই, তা হলে এ ছাড়া আর পথও নাই। এই কঠিন পথেই ধীরে ধীরে আমাদের অগ্রসর হতে হবে।